এই পৃথিবী

এফ. ডি. বুবলেইনিকভ

G

এফ. ডি. বুবলেইনিকভ

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১২

এই পৃথিবী

সূচনা

প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে একটি শাখা হচ্ছে পৃথিবী সম্বন্ধীয় তত্ত্বগুলো নিয়ে। সূর্যের চারপাশে প্রদক্ষিণরত নয়টি গ্রহের একটি হচ্ছে পৃথিবী এবং সূর্যের অন্যতম গ্রহ হিসাবেই পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের জানতে হবে। প্রকৃতিবিজ্ঞানের এই শাখা হচ্ছে জ্যোতির্বিদ্যা, এটা মানবসভ্যতার একটি প্রাচীনতম বিজ্ঞান।

ভূপরিমিতি-বিদ্যা হচ্ছে পৃথিবীর আকৃতি ও আয়তন সম্পর্কীয় বিজ্ঞান।

বর্তমানে পৃথিবীর উপাদান, গঠনপ্রণালী এবং বিভিন্ন গুণাগুণ সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ করা হয়ে থাকে। অপেক্ষাকৃত নতুন বিজ্ঞান যে ভূগোল, এগুলো তারই অন্তর্ভুক্ত।

পৃথিবী সম্বন্ধে এখন আমাদের ধারণা কি ? এর আকৃতি বা আয়তনই বা কি ? পৃথিবীর অন্তঃস্থলে কি আছে ? পৃথিবীর আবর্তনের প্রমাণ কি কি ?

এই সব ও আরও অন্য অনেক প্রশ্নের উত্তর মিলবে আমাদের এই ছোট্ট বই-এ।
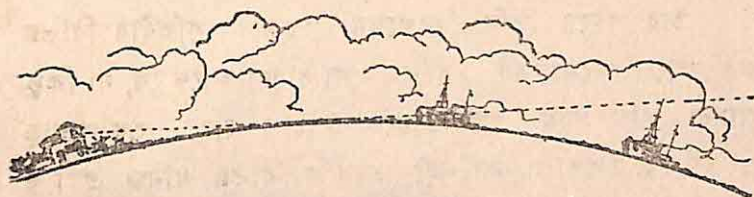
পৃথিবীর আকার

প্রকৃতির অন্তর্গত অন্য সব কিছুর মতোই পৃথিবীও পরিবর্তনশীল। সৃষ্টি থেকেই নানা অবস্থান্তর ঘটে চলেছে এখানে। অভ্যন্তরস্থ বিশাল পরিমাণ গলিত পদার্থের সঙ্কোচনের ফলেই উপরে দেখা যাচ্ছে ক্রমাগত পরিবর্তন—পাহাড় উঠ্ছে, সমুদ্রের তলদেশ যাচ্ছে নেমে কিম্বা উঁচু হয়ে পড়ছে। কোথাও দূর হতে বাতাস কি জলের স্রোত এসে কিম্বা কোথাও উত্তাপের দারুণ তারতম্যের ফলে পৃথিবীর উপরকার উঁচুনীচু সমান করে সমতল করে দিচ্ছে। কাজেই পৃথিবীর উপরটা অনবরত পাল্টেই যাচ্ছে।

পৃথিবীর এই রূপান্তরটা আমাদের কাছে যত সহজ আর সরল মনে হচ্ছে, আগেকার মানুষ কিন্তু অত সহজেই তা বোঝেনি। অনেক দিন ধরেই তাদের ধারণা ছিল পৃথিবীর বুঝি পরিবর্তন নেই। খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের ছিল ঐ মত। ধর্মশাস্ত্রে বলে, সৃষ্টির দিনে পৃথিবী যেমন ছিল, আজও তেমনই আছে।

কয়েকজন বস্তুবাদী বিজ্ঞানীই কেবল ধর্মযাজকদের এই

মতবাদের বিরুদ্ধতা করতে সাহস করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন বিখ্যাত রুশ বৈজ্ঞানিক এম. ভি. লমনসফ্।

তাঁর বইয়ে তিনি লিখেছেন, "সুতরাং পৃথিবীর বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে অনেকেরই এইরকম ভুল ধারণা আছে যে, যা কিছু আমরা দেখি সবই সৃষ্টি হয়েছে ঈশ্বরের দ্বারা; শুধু পাহাড় পর্বতই নয়, উপত্যকা, নদ নদী এমনকি বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য ও তাদের বিভিন্ন গুণাগুণ সব কিছুই ঈশ্বরেরই ইচ্ছায় উৎপন্ন হয়েছে। এরূপ যুক্তি বিজ্ঞানের অগ্রগতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী, স্বভাবতই পৃথিবী-বিষয়ক জ্ঞানেরও বিরোধী। অবশ্য ঐ সব ধূর্ত ব্যক্তিদের পক্ষে সুবিধাজনক হল এই তিনটি শব্দই কণ্ঠস্থ করে রাখা: 'ঈশ্বর সৃষ্টি করিলেন……।"

বহুদিন থেকেই পৃথিবীর আকৃতিটা ঠিক কি রকম তা জানবার জন্য লোকের কৌতূহল ছিল। যদি আমাদের সাধারণ দৃষ্টিশক্তি দিয়ে দেখতে হয়, তবে পৃথিবীকে একটা বিশাল বিস্তীর্ণ সমভূমি হিসাবে ধরে নিতে হয়, যার উপর নীল আকাশটা খিলানের মতো বাঁকা ভাবে এসে পড়েছে। এই সমতল ভূমির উপর কোথাও রয়েছে উত্তুঙ্গ পর্বতশ্রেণী। কিন্তু অনেক আগেই এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সমতল নয়, সর্বত্রই উত্তল।

পৃথিবীর এই অবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায় উচ্চ বস্তুগুলিকে লক্ষ্য করলে। যেমনভাবে সেগুলো দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়, আবার আবির্ভূত হয় দিগন্তরেখায় যেখানে আকাশ আর মাটির মিলন ঘটেছে। যেখান থেকে চতুর্দিকে দিগন্তরেখা দেখা যায়

এমন জায়গা স্থলভাগে পাওয়া শক্ত। পাহাড় পর্বতের কথা ছেড়ে দিলেও, ছোট ছোট ঢিবি ও বনজঙ্গলই দিগন্ত রেখাকে চোখের আড়ালে রেখে দেয়।

সমুদ্রের অবস্থা কিন্তু অন্যরকম, সমুদ্রে দিগন্তরেখা পরিষ্কার দেখা যায়। সেজন্যই নাবিকরাই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছিল যে পাহাড়ের চুড়োটা দেখা যায় প্রথমে, তারপর যতই কাছে আসা যায় ততই পাহাড়ের বেশি অংশ চোখের সামনে এসে যায়, শেষে পাহাড়ের একেবারে পাদদেশ পর্যন্ত দেখা যায়।

তীর থেকে সমুদ্রের ভেতরে চলে যাবার সময়ও নাবিকেরা এই রকমই লক্ষ্য করেছিল। তখন ঠিক এর বিপরীত ঘটল—দেখা গেল পাহাড়গুলো যেন ডুবে যাচ্ছে জলের মধ্যে—প্রথমে বেলা-ভূমি, তার পর ধীরে ধীরে পাহাড়ের চুড়ো পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে গেল দিগন্তরেখায়।

এই আশ্চর্য ব্যাপারটি ঘটল কেন তা সহজেই বোঝা যায়। যদি পৃথিবী সমতল হত তবে পাহাড়গুলো এমনভাবে অদৃশ্য হয়ে যেত না ; কেবল দূরত্বের অনুপাতে তাদের দেখাত আরও ছোট আর অস্পষ্ট। একশ' কিলোমিটার দূরে এই পাহাড়গুলোকে দেখায় যেন একশ মিটার দূরের বাড়ি।

কিন্তু পাহাড়গুলো যখন দিগন্তরেখার পারে দৃষ্টির বাইরে চলে যায়, তখন খুব শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও তাদের আর দেখা সম্ভব নয়। অথচ যদি একটা উঁচু বুরুজ বা তীরবর্তী কোনো পাহাড়ের উপর ওঠা যায় তবে যে জাহাজটা সেইমাত্র দিগন্তে অদৃশ্য হয়ে গেছে সেটাকেও দেখা যাবে।

কোনো পাহাড়ের চুড়োয় বা খুব উঁচু কোন গাছে উঠলে দেখা যাবে দিগ্বলয় যেন বিস্তৃততর হয়েছে।

পৃথিবী যে উত্তল, দিগ্বলয়ের এই বিস্তৃতি তার আর একটি প্রমাণ। পৃথিবী সমতল হলে এমনটি হত না।

পৃথিবীর উত্তলতা সম্বন্ধে আর একটি প্রমাণ এই যে, উত্তর বা দক্ষিণ দিকে ক্রমাগত এগিয়ে গেলে দিগন্তরেখার উপর নতুন নতুন নক্ষত্রের আবির্ভাব দেখা যায় ; তাছাড়া দিগন্তের উপর ধ্রুব-নক্ষত্রের উচ্চতার পরিবর্তনও হয়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে মস্কো থেকে ক্রিমিয়ায় গেলে দেখা যাবে সেখানে দিগন্তরেখার উপর ধ্রুবনক্ষত্রের যে দূরত্ব তা মস্কোয় দেখা ধ্রুবনক্ষত্রের দূরত্বের চেয়ে কম, আর মস্কোতে যে সব নক্ষত্র আকাশের দক্ষিণভাগে দেখা গিয়েছে এখানে সেগুলোও অদৃশ্য হয়ে গেছে।

এইসব দৃষ্টান্ত থেকে লোকের ধারণা হয় যে পৃথিবীর আকৃতি কি জলে কি স্থলে সর্বত্রই উত্তল, কোথাও সমতল নয়।

সূর্য আর চন্দ্রের দৈনিক বা আহ্নিক গতি থেকে আরও একটি প্রমাণ পাওয়া যায়।

সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে চব্বিশ ঘণ্টায় ঘুরে আসছে এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে প্রাচীনকালের পণ্ডিতরা কল্পনা করলেন যে পৃথিবীতে এমন কতকগুলো পথ রয়েছে যার উপর দিয়ে সূর্য রাতে চলাফেরা করে। শেষে তাঁরা বুঝতে পারলেন, পৃথিবী মহা-শূন্যে ঘুরে চলেছে।

সূর্য পৃথিবীর চারপাশে প্রদক্ষিণরত—এই ভুল মতের বিরুদ্ধে

তখন দাঁড়িয়ে গেল—পৃথিবী যে প্রদক্ষিণ করছে, এই সঠিক মতটি।

পণ্ডিতদের পরবর্তী গবেষণার বিষয় হল পৃথিবীর আকৃতি।

পৃথিবী কি একটা উত্তল ঢালের মতো দেখতে? কয়েক জন ভাবলেন তাই বটে। ওঁরা কল্পনা করলেন ঢালের মতো পৃথিবী বসানো রয়েছে তিনটি হাতির মাথায়, যে হাতিগুলো আবার দাঁড়িয়ে আছে একটা কচ্ছপের উপর।

তা যদি না হয় তবে কি একটা ঘনক্ষেত্রের মতো?

কেউ কেউ কল্পনা করলেন যে পৃথিবাটা করাতে কাটা একটা গাছের গুঁড়ির মতো, যার সমতল উপরিভাগে বাস করে মানুষেরা।

কিন্তু পৃথিবীর ছায়া দেখে পুরানো গ্রীসীয় পণ্ডিতরা উপলব্ধি করলেন যে পৃথিবীর আকৃতি গোলাকার।

পৃথিবীর ছায়া দেখা যায় কেমন করে?

পৃথিবীর ছায়া যখন চাঁদের উপর পড়ে তখন সেটা দেখা যায় এটা একটা প্রমাণিত ঘটনা।

পূর্ণিমার সময় সূর্য আর চাঁদের মাঝে পৃথিবী এসে পড়লেই
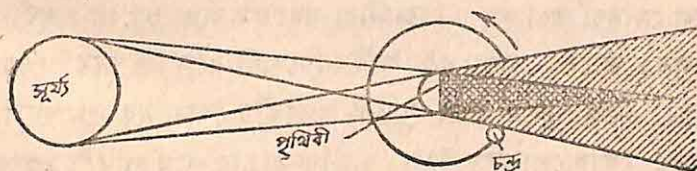
১ নং ছবি

এই ছায়া পড়ে। সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে পৃথিবী মহাশূন্যে তার ছায়া নিক্ষেপ করে, যা দেখা যায় চাঁদের উপর। এই সময়ই হয় পূর্ণ অথবা আংশিক চন্দ্রগ্রহণ (১নং ছবি)।

চন্দ্রগ্রহণ একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। অনেকেই লক্ষ্য করেছেন পৃথিবীর ছায়া কেমন ভাবে আস্তে আস্তে পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের উপর এসে পড়ে। দেওয়ালে কমলালেবুর ছায়া যেমন গোল দেখায়, তেমনি পৃথিবীর ছায়ার প্রান্তভাগ সর্বদাই গোল দেখা যায়। একটা গোলাকার বস্তুরই যে এমন ছায়া হতে পারে এ বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ।

চন্দ্রগ্রহণ লক্ষ্য করে প্রাচীন পণ্ডিতদের পরিষ্কার ধারণা হল যে পৃথিবী গোলাকার। অবশ্য সাধারণ লোকে অনেক দিন পর্যন্ত এই মত মেনে নিতে পারে নি। প্রাচীন কালেই শুধু নয়, মধ্যযুগেও অধিকাংশের ধারণাই ছিল পৃথিবী একটা সমতল ভূমি যার উপর খিলানের মতো দাঁড়িয়ে আছে আকাশটা।

এই মতের বড় সমর্থক ছিলেন ধর্মযাজকরা। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ধর্মযাজকরাই পৃথিবী গোল—এই মতের বিরুদ্ধতা করেছেন সব চেয়ে প্রচণ্ডভাবে। পৃথিবী-বিজ্ঞানকে ধর্মবিরোধী বলে ঘোষণা করা হল। বিজ্ঞানীরা সবরকম অত্যাচারের সম্মুখীন হলেন। তাঁদের লেখা বই আইন-বিরোধী বলে নষ্ট করে দেওয়া হল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে পৃথিবী সম্পর্কীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো আরও জোরালো হয়ে উঠল। জীবনযাত্রার পথে পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞান অতি আবশ্যক বলে গণ্য হল। সমুদ্রযাত্রা শুরু হল। স্পেনীয় এবং পর্তুগীজ নাবিকরা ভারতবর্ষে যাবার পথ খুঁজে পেল। এই দেশটিতে যাবার আরও একটি সংক্ষিপ্ত পথ আবিষ্কারের চেষ্টা হতে লাগল। আফ্রিকা মহাদেশ ঘুরে না গিয়ে

সোজা পশ্চিম দিকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ভারতবর্ষে যাবার পরিকল্পনা দেখা দিল।

সমুদ্রপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণের প্রথম অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হল না। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ক্রিস্টোফার কলম্বাস যাত্রা-পথে বাধা পেলেন আমেরিকা মহাদেশে।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে পৃথিবী প্রদক্ষিণের জন্য এই পথে স্পেনের সমুদ্রতীর থেকে আবার যাত্রা করলেন আর একজন নাবিক, ফারনান্দো মাজেল্লান।

ক্রমাগত পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে হতে তিনি আটলান্টিক মহাসাগর পার হলেন, দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরলেন একটি প্রণালীর মধ্য দিয়ে, শেষে এসে পড়লেন প্রশান্ত মহাসাগরে।

১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে মাজেল্লানের মৃত্যুর পর তার অবশিষ্ট সঙ্গীরা পশ্চিমের যাত্রাপথে ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তবর্তী উত্তমাশা অন্তরীপে উপস্থিত হলেন।

এইরূপে ক্রমাগত পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণের পর জাহাজটি সমুদ্রপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে সক্ষম হল।

মাজেল্লানের অভিযানের পর পৃথিবী যে গোলাকার সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই রইল না। খ্রীষ্টীয় ধর্মে পৃথিবীকে যে "বিশ্বের তলদেশ" বলা হয়, সেই যুক্তি সম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত হল।

অবশ্য এই অভিযান থেকে পৃথিবী যে সম্পূর্ণ গোল তার অবিসম্বাদী প্রমাণ পাওয়া যায় না। ধরা যাক, পৃথিবীর আকৃতি

যদি একটা শশার মতো হয়, তাহলেও তাকে প্রদক্ষিণ করা যাবে।

পৃথিবীর আকৃতি যে প্রায় একটা বলের মতোই তার আর একটা প্রমাণ হল গোল দিগন্তরেখা। যদি পৃথিবী প্রায় বলের মতোই গোল না হত তাহলে দিগন্তরেখাকে অমন বৃত্তাকার দেখা যেত না। এই জন্যই বহুকাল ধরেই পণ্ডিতরা পৃথিবীকে সম্পূর্ণ গোলাকারই ভেবেছেন। অবশ্য পাহাড়পর্বতের উচ্চতা এবং সমুদ্রের গভীর তলদেশের কথা তাঁরা ধরেননি।

পৃথিবীর এই গোল আকারের জন্যই পৃথিবীর পরিমাপ করার সুবিধা হয়েছে।

সমুদ্র পথে ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষত ভূ-প্রদক্ষিণের পর, পৃথিবীর আয়তন সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানলাভের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেড়ে গেল। ভূ-প্রদক্ষিণ শুরু করার আগে জানা দরকার এ অভিযানে কতদিন সময় লাগবে। কেননা তারই উপর নির্ভর করবে কত খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য সরঞ্জাম সঙ্গে নিতে হবে।

পৃথিবীর আয়তন

সকলেই স্কুলের গ্লোব দেখেছেন। এটি হচ্ছে পৃথিবীরই একটি ক্ষুদে সংস্করণ, যার ওপর মহাদেশ, সাগর, উপসাগর, পর্বতশ্রেণী, নদনদী সবই আঁকা আছে।

এই গ্লোবের পরিধি নির্ণয় করা মোটেই শক্ত নয়। সেন্টি-মিটারে মাপ করা একটা ফিতে ওটার চারধারে জড়িয়ে দেখলেই মাপ জানা যাবে কিন্তু পৃথিবীকে তো ঐ ভাবে মাপা সম্ভব নয়, অন্য কোন উপায় বার করতে হবে। এর জন্য আবার আমাদের সেই গ্লোবেরই সাহায্য নিতে হবে।

গ্লোবের উপর আঁকা রয়েছে অনেকগুলি রেখা ; দুই মেরু অতিক্রম করে চলে গিয়েছে রেখাগুলো। এগুলো হচ্ছে দ্রাঘিমা রেখা। প্রত্যেক দ্রাঘিমা রেখা ৩৬০ ডিগ্রিতে বিভক্ত। এক এক ডিগ্রির দূরত্ব পরিমাপ করতে গেলে গোলকের পরিধি নির্ণয় করতে হবে। ধরা যাক, এই গোলকের ওপরে একটি দ্রাঘিমা-রেখার ২০ ডিগ্রি পরিমাণ অংশের দৈর্ঘ্য ৫ সেন্টিমিটার। তাহলে ১ ডিগ্রির পরিমাণ $\frac{১}{৪}$ সেন্টিমিটার এবং গোলকটির পরিধি হচ্ছে $\frac{১}{৪} \times ৩৬০ = ৯০$ সেন্টিমিটার। এমনিভাবে গোলকটির সমস্ত পরিধি না মেপেই অন্য উপায়ে পরিধি নির্ণয় করা যায়।

ঠিক ঐ উপায়েই পৃথিবীর পরিধিও নির্ণয় করা যায়।

প্রথমেই প্রয়োজন পৃথিবীর উপর এক বা কয়েক ডিগ্রি পরিমাণ একটি দ্রাঘিমারেখা চিহ্নিত করা। এরপর ঐটুকু

দূরত্বের মাপ জেনে পৃথিবীর পরিধি হিসাব করা যেতে পারে।

যদি সূর্যের দৈনিক গতি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে পৃথিবীর উপর দ্রাঘিমারেখা বা মধ্যরেখা অঙ্কিত করা খুব শক্ত নয়।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য ক্রমেই উপরে উঠতে থাকে। যতক্ষণ না ঐ বিশেষ স্থানের মধ্যরেখা এবং একটি কল্পিত লম্বের বিভক্তি স্থানটি অতিক্রম করে যায় ততক্ষণ সূর্যের উপরে ওঠা থামে না।

সময়টি হচ্ছে মধ্যাহ্ন। এই সময়েই সূর্য সর্বোচ্চ স্থানে থাকে। এরপরই আস্তে আস্তে সূর্য নামতে থাকে অস্ত যাবার জন্য।

মধ্যাহ্নের সময় যখন সূর্য সর্বোচ্চ গগনে থাকে তখন সূর্যের এই আকাশচারীগতি লক্ষ্য করে মধ্যরেখার দিক নির্ণয় করা যেতে পারে।

এখন মনে করা যাক, একই দ্রাঘিমারেখার উপর তুজন পর্যবেক্ষক একশ' কিলোমিটার দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তুই স্থানেরই মধ্যাহ্নের সময় একই। কিন্তু দিগন্তরেখার উপর সূর্যের উচ্চতা অর্থাৎ সূর্যরশ্মি এবং দিগন্ত রেখার মধ্যকার কোণ তুই স্থানে তুই রকম হবে। পর্যবেক্ষকটি যতই দক্ষিণে থাকবেন, ততই উচ্চতাও বেশি হবে।

উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক, একজন রয়েছেন মস্কোয় আর একজন কিয়েভে। ঐ তুই শহর প্রায় একই দ্রাঘিমারেখার উপর অবস্থিত। তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের পরিমাপ মধ্যরেখার হিসাবে প্রায় ১০ ডিগ্রি।

যদি দুজন পর্যবেক্ষকই একই মধ্যাহ্ন সূর্যের উচ্চতা মাপেন, তবে দেখা যাবে কিয়েভে সূর্যের উচ্চতা ১০ ডিগ্রি বেশি।

বৎসরের বিভিন্ন সময়ে সূর্যের উচ্চতাও যে বিভিন্ন হয় সকলেই তা জানেন।

কিন্তু যেদিনই হোক না কেন, ঐ দুই শহরে মধ্যাহ্নকালের সূর্যের উচ্চতায় একই পার্থক্য থাকবে—প্রায় ১০ ডিগ্রি পার্থক্য।

এর থেকে বোঝা যায়, একই দ্রাঘিমা রেখায় অবস্থিত দুইটি স্থানের সূর্যের উচ্চতার পার্থক্য তাদের মধ্যবর্তী দ্রাঘিমা রেখার ডিগ্রি পরিমাণের সমান।

এই তথ্যটি পৃথিবীর আয়তন নির্ণয়ে ব্যবহার করা হয়।

একই দ্রাঘিমারেখায় অবস্থিত দুইটি স্থানের সূর্যের উচ্চতা একই দিন মধ্যাহ্নে গ্রহণ করা হয়। এই দুই উচ্চতার পার্থক্য থেকে নির্ণীত হয় এই দুই স্থানের অন্তবর্তী দ্রাঘিমারেখার পরিমাণ।

এবার শুধু ঐ দুই স্থানের দূরত্ব কিলোমিটারে মেপে নিলেই চলবে। কিন্তু এ কাজটি খুব সহজ নয়।

কয়েক কিলোমিটার দূরের দুটো গাছের মধ্যের দূরত্ব নির্ণয় করতে চেষ্টা করা যাক। এই কাজটি খুবই কঠিন, কেননা ঐ দুটি গাছের মধ্যের স্থলভাগ খুবই অসমতল—ঢিবি, মাঠ, নিম্নভূমি, খাদ সবই মাঝখানে থাকতে পারে। আর ওদিকে দ্রাঘিমা-রেখার দূরত্ব মাপতে হবে কয়েক শ' কিলোমিটার ধরে।

তবে কেমন করে বৈজ্ঞানিকরা এই বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হলেন ?

পৃথিবীর আয়তনের প্রথম পরিমাপ করেছিলেন সেই প্রাচীন কালের গ্রীক পণ্ডিত এরাট সফেন। তাঁর বাস ছিল আলেকজান্দ্রিয়া শহরে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে। জ্যোতির্বিদ্যা অনুশীলন কালে গ্রীষ্মের সময় প্রত্যেক ২০শে জুন তিনি সূর্যের মধ্যাহ্ন-উচ্চতা নির্ণয় করতেন।

উটবাহী যাত্রীদের পথপ্রদর্শকদের কাছ থেকে ঐ বৈজ্ঞানিকটি জানতে পারেন যে বৎসরের ঐ সময়টিতেই দক্ষিণের সিয়েন শহরে মধ্যাহ্নকালে একেবারে জলকূপের অন্তঃস্থল পর্যন্ত সূর্যের আলো পড়ে। এ থেকে বোঝা যায় যে ঐ সময় সূর্য
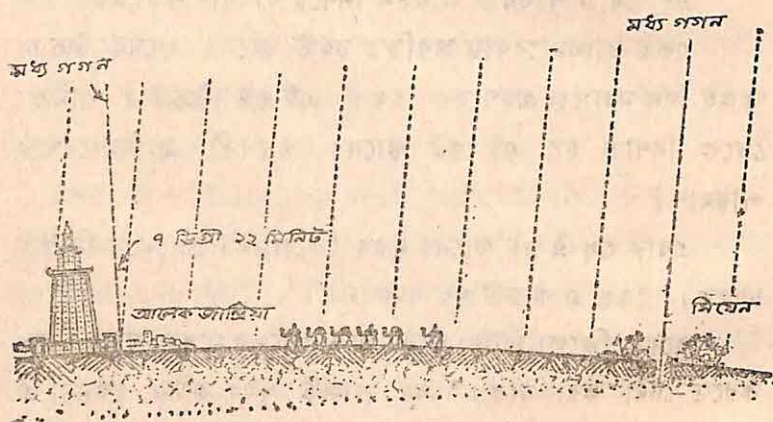
২নং ছবি

থাকে ঠিক মাথার উপর, মধ্যগগনে। ব্যবধান হচ্ছে আলেকজান্দ্রিয়া এবং সিয়েনের মধ্যে সূর্যের উচ্চতার ৭ ডিগ্রি অর্থাৎ পৃথিবীর পরিধির প্রায় পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ (২নং ছবি)।

এখন ঐ শহর দুটির মধ্যকার দূরত্ব জানা প্রয়োজন। কিন্তু এরাটসফেন এই দূরত্বের পরিমাপ করতে পারলেন না। পথ-প্রদর্শকদের কথায় নির্ভর করে তিনি জানলেন আলেকজান্দ্রিয়া থেকে সিয়েনের দূরত্ব মিশরীয় হিসাবে প্রায় ৫০০০ স্টেডিয়া (এক স্টেডিয়া প্রায় ০·১৫ কিলোমিটারের সমান)

এবার পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করা খুবই সহজ—প্রায় ৫০০০ × ৫০ = ২৫০০০০ স্টেডিয়া, অর্থাৎ প্রায় ৩৭৫০০ কিলো-মিটার। এই পরিমাপ কিন্তু সম্পূর্ণ সঠিক নয়, কাছাকাছি হিসাব। পরে আমরা দেখব পৃথিবীর পরিধি আসলে প্রায় ৪০০০০ কিলোমিটার।

এরাটসফেনের পরবর্তী অনেক বৈজ্ঞানিকই পৃথিবী পরিমাপ করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুজন আরব জোতির্বিদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যাঁরা ১ ডিগ্রি দ্রাঘিমারেখার পরিমাণ স্থলভাগ মেসোপটেমিয়ার সমতলভূমিতে নির্ণয় করেছিলেন।

এইস্থান দুটিতে তাঁরা প্রথমে ধ্রুবতারার উচ্চতা পরিমাপ করেন। তারপর একজন চললেন দক্ষিণে, আর একজন উত্তরে।

এঁদের সহকারীরা কাঠের ডাণ্ডার সাহয্যে অতিক্রান্ত দূরত্ব মেপে চল্‌ল আর ঐ বিজ্ঞানী দুজন রাতে ধ্রুবতারার উচ্চতা নিরূপণ করলেন।

যে বৈজ্ঞানিক উত্তরে যাচ্ছিলেন তিনি দেখলেন তারাটিও ক্রমশ দিগন্তরেখার থেকে ক্রমশ উঁচু হচ্ছে। দক্ষিণের বৈজ্ঞানিক দেখলেন ঠিক এর বিপরীত। তারাটা নেমে যাচ্ছে।

প্রথম স্থানটি থেকে যখন উচ্চতার পরিমাপ হল এক ডিগ্রি

তখন তাদের পথ চলা শেষ হল। প্রত্যেকেই দ্রাঘিমারেখার এক ডিগ্রী পরিমাণ অংশ অতিক্রম করেছেন। অর্থাৎ দুজনে তাঁরা অতিক্রম করেছেন দুই ডিগ্রি পরিমাণ স্থলভাগ।

অবশ্য পৃথিবীর পরিধি নির্ণয়ের এই উপায় সম্পূর্ণ সঠিক নয়, কারণ যে পথ দিয়ে তাঁরা গেছেন সে পথ সম্পূর্ণ সমতল নয়।

সপ্তদশ শতাব্দীতেই প্রথম একই দ্রাঘিমারেখার অন্তর্গত কোনো স্থলভাগের দূরত্ব পরিমাপ করবার নির্ভুল উপায় আবিষ্কৃত হল। সেই উপায়টি হল এইরূপ—দ্রাঘিমারেখার অনুযায়ী স্থলভাগের দুইপার্শ্বে সারি সারি কয়েকটি চিহ্নবস্তু ঠিক করা হল যেগুলোর একটি থেকে একই সারির অন্তত অপর দুটিকে একসঙ্গে দেখা যাবেই। এইসব চিহ্নবস্তুগুলোকে কল্পনায় যুক্ত করলে দ্রাঘিমারেখার অনুযায়ী স্থলভাগের উপর অসংখ্য ছোট ছোট ত্রিভুজের সৃষ্টি হবে।

ঐ সমস্ত দূরত্ব এবং ত্রিভুজের অন্তর্গত কোণগুলির পরিমাণ জানা থাকলে নির্ণেয় স্থলভাগের পরিমাণও জানা যাবে। (৩নং ছবি)

ঐ ত্রিভুজের কোণের পরিমাণ করা বিশেষ শক্ত নয়। কোনো পরিমাপিক যন্ত্রের সাহায্যে তা অত্যন্ত সঠিকভাবেই করা যায় (গোনিওমিটার)।

ঐ ত্রিভুজগুলোর কোণের পরিমাপ করা বিশেষ শক্ত নয়। কোনো পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে তা অত্যন্ত সঠিক ভাবেই করা যায় (গোনিওমিটার)।

এর চেয়েও শক্ত হচ্ছে ত্রিভুজগুলির বাহুর দৈর্ঘ্য নিরূপন করা। কিন্তু পণ্ডিতেরা এটাও করলেন। সমতলভূমিতে অবস্থিত ত্রিভুজের ক্ষুদ্রতম বাহুটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা হল। এইটি হল
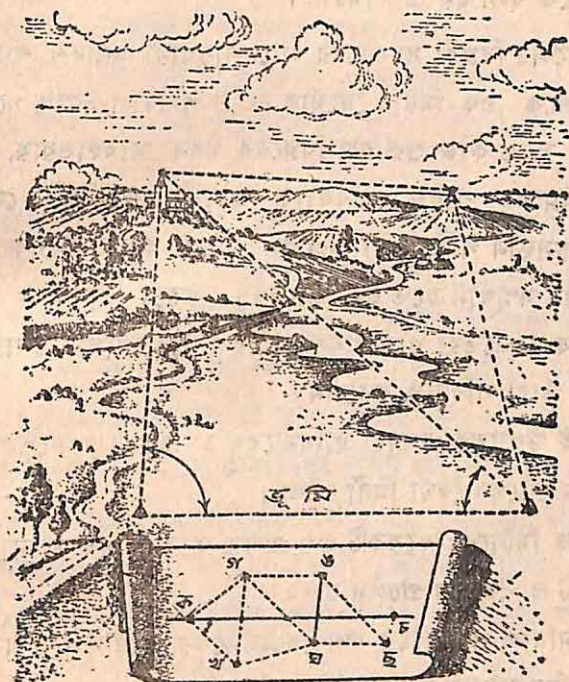
৩নং ছবি

ত্রিভুজের 'ভূমি'। এই থেকে অঙ্কের সাহায্যে অপর বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য নিরূপিত হল।

এরপর দ্রাঘিমারেখার দৈর্ঘ্যও নির্ণয় করা হল। এই উপায়ে অনেক দীর্ঘ দ্রাঘিমারেখার দূরত্বও খুবই সঠিক ভাবে স্থির

করা সম্ভব হল। এই বিদ্যাকে বলা হয় 'ত্রিভুজীকরণ'।

পারীর উপরে দ্রাঘিমারেখার এক চতুর্থাংশের এক কোটি ভাগের এক ভাগ স্থলভাগকেই ধরা হল একক হিসাবে। এই পরিমাপকে বলা হয় এক মিটার।

ফ্রান্সের বিপ্লবী সরকারের আদেশানুযায়ী অষ্টাদশ শতাব্দীর নবম দশকে এক মিটার দৈর্ঘ্যের ডিগ্রি পরিমাপ সম্বন্ধে গবেষণা চলল। সমস্ত কাজ শুরু হল বিপ্লবের গরম আবহাওয়ায়, আর চলল বিপ্লবের পরেও। বিখ্যাত ফরাসী জ্যোতির্বিদ দেলাম্ব্র সমস্ত অনুসন্ধান পরিচালনা করলেন। এই কাজে অনেক বিপদ ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হল তাঁদের। উত্তরে ডানকার্ক থেকে দক্ষিণে ফরমেনতেরা দ্বীপ পর্যন্ত পারীর উপরে দ্রাঘিমারেখানুযায়ী স্থলভাগ তাঁরা পরিমাপ করলেন।

এই উপায়েই পারীর দ্রাঘিমারেখার এক চতুর্থাংশের এক কোটিতম ভাগের দৈর্ঘ্য নির্ণীত হল।

এক মিটারের কয়েকটি দণ্ড প্রস্তুত করে ঐ সব স্থানে রাখা হল, মেট্রিক পদ্ধতির প্রচলন হল।

উনবিংশ শতাব্দীতে রুশ বৈজ্ঞানিকেরাও ঐ উপায় অবলম্বন করে দ্রাঘিমারেখার অনেকখানি পরিমাপ করলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাশিয়ায় ভৌগলিক মানচিত্র অঙ্কন করা শুরু হল ত্রিভুজীকরণের ভিত্তিতে, অর্থাৎ মানচিত্রে নদী, হ্রদ, গ্রাম, জঙ্গল এবং অন্য সব কিছুর স্থান নির্দেশ করতে প্রাথমিকভাবে সমস্ত স্থানটিকে অসংখ্য ত্রিভুজে ভাগ করে ফেলা হল। এইভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং উনবিংশ

শতাব্দীর প্রথমভাগে রাশিয়ায় কাজ চলল। এই ত্রিভুজীকরণের সাহায্যে দ্রাঘিমারেখার পরিমাপের কাজও হল।

এই উপায়ের কথা বিখ্যাত রুশ জ্যোতির্বিদ ভে, ইয়া, স্ত্রুভের মাথায়ই প্রথম এসেছিল। তখন (১৮১৩ সালে) তিনি উরেভ শহরের মানমন্দিরে ছিলেন (এখন এস্তোনিয়ায়)।

ত্রিভুজীকরণের পদ্ধতিতে সমগ্র এস্তোনিয়া জরীপের ভার ছিল তাঁর উপর। ১৮১৬ থেকে ১৮১৯ সালের মধ্যেই তাঁর কাজ শেষ হল।

এরপরও এই জরীপ স্ত্রুভে চালিয়ে যান ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের গগল্যাণ্ড দ্বীপ এবং আরও উত্তরে তরনেও পর্যন্ত। এরই সঙ্গে এস্তোনিয়ার দক্ষিণে দানিয়ুব সংলগ্ন ভূখণ্ডও জরীপ করা হয়। এই জরীপের পর ২০ ডিগ্রি পরিমিত দ্রাঘিমারেখার পরিমাপ করা সম্ভব হয় এবং এই দূরত্ব নির্ণীতও হয়।

বারেনসেভ সাগর থেকে দানিয়ুব পর্যন্ত এই পরিমাপ সমাপ্ত হয় ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। ২৫ ডিগ্রি ব্যাপী এই দ্রাঘিমারেখার দুই প্রান্তে পাথরের স্তম্ভের উপর তিন পলা লৌহখণ্ড স্থাপন করা হল। পৃথিবীর আয়তন পরিমাপে রুশ বৈজ্ঞানিকদের অসীম পরিশ্রমের স্মারক এগুলি।

কিন্তু আমরা আগেই বলেছি পৃথিবী সম্পূর্ণ গোল নয়। দ্রাঘিমারেখার ডিগ্রি বিচার করে যে বৈজ্ঞানিকরা এই সত্যে উপনীত হয়েছিলেন তা নয়। পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে তাঁরা যতটা জানতে পেরেছিলেন তা থেকেই এটা তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন।

পৃথিবীর মেরুপ্রান্তিক সঙ্কোচন

ষোড়শ শতক পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা চন্দ্র, সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্রের আহ্নিক গতি সম্বন্ধে বিশ্বাস করতেন। সম্ভবত অনেকেই লক্ষ্য করেছেন উত্তরদিকে সন্ধ্যাবেলার নক্ষত্রমণ্ডলী ধ্রুবনক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করে (আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে ধ্রুবনক্ষত্রের নিকটবর্তী আকাশকেই প্রদক্ষিণ করে—যাকে বলা হয় মেরুপ্রদেশ।)

দিনের বেলায় যদি নক্ষত্রগুলোকে দেখা যেত তাহলে দেখা যেত ওরাও ২৪ ঘণ্টায় সমস্ত পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে।

মেরু থেকে তারাগুলো যত বেশী দূরে অবস্থিত ততই বৃহত্তর বৃত্তাকারে তারা ঘুরছে। যদি নক্ষত্রটি খুবই দূরের হয় তবে তার গতিপথের কিছুটা দিগন্তরেখার নিম্নেই হবে, অর্থাৎ সূর্যের মতো সেটিরও উদয় হবে, আকাশের উপর দিয়ে ধনুকের মতো গিয়ে সেটা অস্তও যাবে।

কিন্তু এই গতি সত্ত্বেও নক্ষত্রগুলির নিজের স্থান বিশেষ পরিবর্তিত হয় না, যেন ওগুলো আকাশে আটকানো।

যদি রাতে নক্ষত্রের গতি লক্ষ্য করা যায় তাহলে মনে হয় সমস্ত আকাশ যেন ধ্রুব নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর উপর ঘুরে যাচ্ছে।

অনেক আগে গ্রীক পণ্ডিতেরাও তাই মনে করেছিলেন। নক্ষত্রের দৈনিক গতিকে তাঁরা 'আকাশের' আবর্তন নাম দিয়ে-

ছিলেন, কেননা তাঁরা কল্পনা করতেন, আকাশের খিলানটা রয়েছে বৃহত্তর ভূগোলকের শক্ত আবরণের নীচে।

আকাশে চন্দ্র, সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহগুলো সবই যে বৃত্তাকারে মহাশূন্যে ঘুরছে এটা গ্রীকদেশের বৈজ্ঞানিকরা কল্পনাও করেন নি। এই কারণেই তাদের আবর্তনকে তাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে ওগুলো বিভিন্ন গোলকে প্রোথিত রয়েছে।

বিভিন্ন গোলকের কথা মনে করা হয়েছে এইজন্য যে চন্দ্র, সূর্য এবং অন্য গ্রহগুলো নক্ষত্রগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়ায় এবং তাই নক্ষত্র-সংযুক্ত গোলকে ওগুলোও অবস্থিত একথা মনে করা যায় না। যাই হোক, একটি গোলকের আবর্তনের ভিত্তিতে সূর্য, চন্দ্র এবং গ্রহগুলোর সম্ভাব্য স্থান আকাশে নির্দেশ করা সম্ভব নয়।

এর পর দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে গ্রীক জ্যোতির্বিদ ক্লাভদি টলেমি জ্যামিতিক তত্ত্বের ভিত্তিতে নক্ষত্র ইত্যাদির গতিবিধির একটি নিয়ম খাড়া করলেন। তাঁর যুক্তি হল প্রত্যেক গ্রহই বৃত্তাকারে ঘুরছে, সেই বৃত্তের কেন্দ্রটি আবার ঘুরছে পৃথিবীর চতুর্দিকে বৃত্তপথে।

এই যুক্তির সাহায্যে অসংখ্য নক্ষত্রের মাঝে পৃথিবীর আবর্তন সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। অবশ্য কেন যে গ্রহগুলো মহাশূন্যে একটা কাল্পনিক কেন্দ্রের চারপাশে ঘুরছে, কেন যে আবার ঐ কেন্দ্রটা ঘুরে চলেছে পৃথিবীর চারদিকে—তা বোঝা তখন সম্ভব হয় নি।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে স্পেনদেশের রাজা সৌখীন জ্যোতির্বিদ দশম আলফঁসো যে বলেছিলেন ভগবান তাঁর পরামর্শ নিলে জগৎটা অনেক সহজভাবে গঠিত হত, এতে আশ্চর্য হবার বিশেষ কিছু নেই।

আলফঁসো এই উক্তির জন্য হারালেন তাঁর সিংহাসন। কারণ টলেমির মতবাদ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের অনুকূল ছিল আর সেই মধ্যযুগে ধর্মসম্প্রদায়ের প্রভাবও ছিল প্রচণ্ড।

পুরানো ধর্মসম্বন্ধীয় রীতিনীতি যে সব শাস্ত্রে লিখিত আছে সেই 'পবিত্র শাস্ত্রে' বলা হয়েছে যে আমাদের পৃথিবীই সমস্ত বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত; সূর্যের চারপাশে পৃথিবী তো ঘোরেই না, পৃথিবী হচ্ছে একেবারে নিষ্কম্প, অচল। টলেমি এই অভিমতের বিরুদ্ধতা করেন নি।

কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে বিখ্যাত পোলিশ বিজ্ঞানী নিকোলাই কোপার্নিকাস প্রমাণ করলেন যে জগতের সৃষ্টিকে যতটা জটিল বলা হয়, ততটা নয়। নক্ষত্রগুলোর আপাত গতিকে সত্য বলে ধরে নেবার জন্যই জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় এক কাল্পনিক অক্ষের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে। এই কারণেই পৃথিবীর উপর থেকে আমরা দেখতে পাই যে সূর্য পেছন থেকে আবির্ভূত হচ্ছে। আমরা একে বলি সূর্য উদিত হল।

ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর উপরে থেকে আমরাও ঘুরছি আর মনে করছি সূর্য কেমন আকাশ পথে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে।

শান্ত সমুদ্রের উপর দিয়ে দ্রুতবেগে চলমান কোনো জাহাজের ডেকের উপর দাঁড়িয়ে যেমন বোঝা যায় না জাহাজটা চলছে কিনা, তেমনি পৃথিবীর আবর্তনও আমরা বুঝতে পারি না। পৃথিবীর আবর্তন সম্পর্কে কোপার্নিকাসের মত সমর্থন করে প্রসিদ্ধ ইতালীয় বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও বিশেষভাবে ঐ উদাহরণটিই দেন। সৌরজগৎ সম্বন্ধে কোপার্নিকাসের এই নতুন তত্ত্ব একটি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। জগৎ সম্বন্ধে পূর্বেকার ধারণা এবং পৃথিবী ও আকাশ সম্পর্কে সমস্ত ধর্মীয় কুসংস্কার ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হল এই মতবাদের দ্বারা। এঙ্গেলস লিখেছেন যে কোপার্নিকাসের এই অবিনশ্বর কীর্তি "প্রকৃতি বিজ্ঞানে ধর্মযাজকদের প্রভাবের মূর্ত প্রতিবাদ।"

কয়েকটি অখণ্ডনীয় সত্যের উপর কোপার্নিকাসের মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত।

গত শতাব্দীতে দোলকের সাহায্যে পৃথিবীর আবর্তন প্রমাণ করা হয়েছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমরা পরে বলছি।

মনে করা যাক্ পৃথিবী তার কাল্পনিক অক্ষের চারিপাশে ঘুরছে। এই অক্ষ মেরুদ্বয়ের মধ্য দিয়ে চলে গেছে।

পৃথিবীর আবর্তন প্রতিফলিত হয়েছে তার আকৃতিতে। কেমন করে তা হল তা বুঝতে হলে জলের সঙ্গে স্পিরিট মিশিয়ে তার মধ্যে খানিকটা তেল দিয়ে সেই তেলকে ঘোরাতে হবে।

জল এবং স্পিরিট একটা গেলাসে এমন মাত্রায় মেশানো হল যে তেল উপরেও ওঠে না নীচেও নামে না। দেখা যাবে ওটা গোল আকার ধারণ করেছে।

এরপর তেলের মধ্যে সাবধানে ঢুকিয়ে দিতে হবে একটা সরু লম্বা পিন। পিনটা ঢোকাতে পারলে দেখা যাবে আশ্চর্য একটা দৃশ্য। যদি পিনটার মধ্য দিয়ে লম্বালম্বিভাবে কাল্পনিক কোন রেখাকে অক্ষ হিসাবে রেখে ঘড়ির কাঁটার মতো পিনটা জোরে ঘোরান যায়, তবে পিনটার সামান্য ঘর্ষণের ফলে আস্তে আস্তে তেলটাই ঘুরতে আরম্ভ করবে। ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে পিনটা যেখান দিয়ে তেলের মধ্যে ঢুকেছে আর বার হয়েছে সেই দুই জায়গায় অর্থাৎ দুই মেরুতে তেল খানিকটা চ্যাপ্টা হয়ে যাবে এবং ওর মাঝমাঝি অর্থাৎ বিষুবরেখা অঞ্চলে স্ফীত হবে। আবার গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই দুটি জিনিসই আরও স্পষ্ট হবে। যদি গোলকটি কঠিন, বাধাশীল কিছু হত তবে কেন্দ্রাতিগ শক্তি এমনভাবে কাজ করতে পারত না।

এর কারণ খুবই সহজ। বিষুবরেখার কাছাকাছি অংশ সবচেয়ে জোরে ঘোরে, কারণ ওখানেই বৃত্তপথ বৃহত্তম, আর মেরু-দেশে সবচেয়ে আস্তে ঘোরে। কাজেই বিষুবরেখা অঞ্চল কেন্দ্রাতিগ শক্তির বহির্মুখী ধাক্কায় অক্ষ থেকে বেশি দূরে গিয়ে পড়বে এবং এটা কম হবে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। সুতরাং কেন্দ্রাতিগ শক্তি যেখানে সবচেয়ে কম অর্থাৎ মেরু অঞ্চলটা ক্রমশ চ্যাপ্টা হয়ে আসবে।

পৃথিবীর প্রান্তিক সঙ্কোচনের এই ব্যাখ্যা প্রথম করেন বিখ্যাত ইংরাজ বৈজ্ঞানিক নিউটন। কিন্তু অপরপক্ষে ফরাসী বৈজ্ঞানিকেরা বলতে থাকেন মেরুরেখার দুই প্রান্তে পৃথিবী প্রসারিতই হয়েছে, সঙ্কুচিত নয়।

এই মত-বিরোধের মীমাংসা করতে হলে বিষুবরেখা এবং দ্রাঘিমারেখার তুলনা করা দরকার।

যদি পৃথিবী মেরুদেশে কিছুটা চাপা হয়ে থাকে তবে দ্রাঘিমারেখার পরিমাণ বিষুবরেখার চেয়ে কিছু কম হবে। এর অর্থ এই যে, মেরুদেশে দ্রাঘিমারেখার ডিগ্রির পরিমাণ বিষুব রেখায় নির্ণীত পরিমাণের চেয়ে কম হবে।

এই রহস্যের সমাধান করতে ফরাসী বিজ্ঞান পরিষদ ছুটি অভিযানের আয়োজন করলেন—একটি লাপল্যাণ্ডে, অপরটি দক্ষিণ আমেরিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলে। সাত বৎসর পরে এই অভিযানের ফলাফল জানা গেল। যখন মেরু এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলে ডিগ্রি পরিমাপ করা হল তখন দেখা গেল যে, মেরু-সন্নিহিত ব্যাসার্ধটি বিষুব রৈখিক ব্যাসার্ধের চেয়ে প্রায় ২·১৫ কিলোমিটার ছোট।

সুতরাং পৃথিবীর আকারের কথা ভাবলে আমাদের মনে পড়ে যায় কমলা লেবুর কথা, যদিও পৃথিবী অতটা চাপা নয়। চাঁদ থেকে বা এইরকম দূর থেকে পৃথবীকে দেখলে এই অসমতা বোঝা যাবে না। পৃথিবীর এই চ্যাপ্টা অংশটা মাপা হয় পৃথিবীর মেরু সন্নিহিত এবং নিরক্ষীয় ব্যাসার্ধের ব্যবধানকে নিরক্ষীয় ব্যাসার্ধ দ্বারা ভাগ করে। ক্ষুদ্র একটি ভগ্নাংশের সাহায্যেই এই হিসাবটা বোঝানো হয়।

ব্যাসার্ধ আর সঙ্কোচন নির্ণয় করেছেন অনেক রুশ ও অন্য বিদেশী বৈজ্ঞানিকরা। সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক এফ. এন. ক্রাসভ্স্কি এই কাজটি করেছেন। অত্যন্ত সঠিকভাবে তিনি এই তথ্যগুলি নির্ণয় করেছেন। তাঁর গণনানুযায়ী নিরক্ষীয় ব্যাসার্ধ

৬৩৭৮·২৪৫ কিলোমিটার আর মেরু সন্নিহিত ব্যাসার্ধ ৬৩৫৬·৮৬৩ কিলোমিটার। অর্থাৎ সঙ্কোচনের পরিমাপ হচ্ছে $\frac{১}{২৯৮·৩}$।

সাধারণত পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ৬৩৭১ কিলোমিটার ধরা হয়ে থাকে, কেননা ঐ ব্যাসার্ধের কোনো গোলকের আকার এবং আয়তন প্রায় পৃথিবীর সমানই হবে।

পৃথিবীর এই আকার সম্বন্ধে গবেষণার ফলে জানা গেল যে পৃথিবীর এই সঙ্কোচন কেবল মেরুরেখার প্রান্তে মেরু দেশেই নয় বিষুবরেখার সমতল পৃষ্ঠেও অবস্থিত, অর্থাৎ বিষুবরেখার ব্যাসও সমান নয়। অবশ্য এই চ্যাপ্টানোর পরিমাণ বেশি নয়, সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে ছোট ব্যাসের মধ্যে তফাৎ মাত্র ২১৩ মিটার। যাই হোক, অল্প হলেও তা আছে।

যখন পণ্ডিতরা পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন তখন এর পৃষ্ঠদেশের কথাই ভেবেছেন। বিলিয়ার্ডের বলের মতো পৃথিবী মসৃণ নয়। ঢিবি, পর্বতশ্রেণী, উপত্যকা, গভীর সাগর উপসাগর রয়েছে এর উপর। সেজন্য পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশকে সমুদ্রের অনুভূমিক ধরে নিয়েছেন তাঁরা।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কেমন করে পৃথিবীপৃষ্ঠের উচ্চতা নির্ণয় করা যাবে এক মহাদেশে ?

এই ক্ষেত্রেও সমুদ্রের অনুভূমিকেই গ্রহণ করা হয় গণনার সময়।

ধরা যাক্ সমস্ত মহাদেশের মধ্য দিয়ে আমরা এমন কতকগুলো গভীর খাল খনন করলাম যার সাহায্যে প্রত্যেকটি সাগর

ও মহাসাগর পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেল। এই সব কাল্পনিক খালের জলের উচ্চতাকেও ভূপৃষ্ঠ বলে বৈজ্ঞানিকরা মনে করবেন।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি

পাহাড়ের চুড়ো থেকে একটা পাথর খসে পড়লে তা শরাহত পাখির কিম্বা গাছ থেকে খসে পড়া আপেলের মতো সোঁ করে নিচে নেমে আসে। অতীতে অনেক চিন্তানায়ক এর কারণ খুঁজে বার করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কোনো সমাধান পান নি।

পুরাকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত আরিস্টটল এই সম্পর্কে বলেছেন, "জিনিসগুলো পড়ে যায়, তার কারণ ওগুলো ভারী"। কিন্তু ভারের জন্য পতন ঘটবে কেন ?

মহাশূন্যে ঘুর্ণায়মান গ্রহনক্ষত্র থেকেই এর উত্তর পাওয়া যেতে পারে।

শূন্যে সমস্ত কিছুই, কি নক্ষত্র, কি গ্রহ, কি ধূমকেতু সবই ঘুরছে। এই ঘোরার সময় প্রত্যেকেই অপরকে আকর্ষণ করছে। এটা হচ্ছে প্রকৃতির একটা সার্বজনীন নিয়ম।

যদি এই পারস্পরিক আকর্ষণ না থাকত তাহলে প্রত্যেকেই এক রেখায় চলত, কারণ প্রত্যেক বস্তুই সরলরেখায় চলে। এই কারণেই একটা আকস্মিক বড় বাঁকের মুখে ঘোড়সওয়ার জিন থেকে সামনে ঝুঁকে পড়ে, কারণ তার শরীর সেই পূর্বের গতিরেখানুযায়ীই চলছে। প্রত্যেক বস্তুরই ধর্ম সরলরেখায় গতিপথ স্থির রাখা। স্ব স্ব গতি রক্ষা করাকে বলা হয় জাড্য।

ঘুরন্ত কোনো বস্তু তার কেন্দ্রাতিগ শক্তির জোরে কেমন করে তার সংলগ্ন দড়িকে প্রসারিত করে সে কথা আমি আগেই বলেছি। এই কেন্দ্রাতিগ শক্তি আর কিছুই নয় সরলরেখা থেকে গতির দিক পরিবর্তনে বস্তুটির অর্থাৎ জাড্যজনিত তার যে বাধা সেটাই হচ্ছে কেন্দ্রাতিগ শক্তি। যদি দড়িটি ছিঁড়ে যায় তখন বস্তুটি জাড্যের প্রভাবে যে বৃত্তে ঘুরছিল এবং বিচ্যুত হবার মুহূর্তে যে স্থানে ছিল সেখান থেকে সরলরেখায় দূরে নিক্ষিপ্ত হবে।

ঠিক এই উপায়েই গ্রহগুলো তাদের কক্ষেই আবদ্ধ থাকে। এ ক্ষেত্রে দড়ির বদলে সূর্যের আকর্ষণ তাদের আটকে রেখেছে।

সূর্য এবং গ্রহগুলো পরস্পরকে আকর্ষণ করছে, কিন্তু সূর্যের আকর্ষণী শক্তি প্রত্যেক গ্রহের অকর্ষণী শক্তির চেয়ে অনেক বেশি এবং সূর্যের ভরও ঐ গ্রহগুলোর ভর অপেক্ষা অনেক বেশি।

সৌর জগতের সব গ্রহই জাড্যের প্রভাবে সরলরেখায় ধাবমান হত, কিন্তু সূর্যের আকর্ষণী শক্তি ক্রমাগতই এদের সেই পথ থেকে বিচ্যুত করছে। কাজেই তাদের গতিপথ কেবলই বেঁকে যাচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত গতিপথটা হয়ে পড়েছে একটা বৃত্তের মতো।

এই তত্ত্বও সপ্তদশ শতব্দীতে ইংরাজ বৈজ্ঞানিক হুক আবিষ্কার করেন। কিন্তু তিনি এ সম্বন্ধে এবং গ্রহনক্ষত্রের গতির নিয়মাবলী সম্পর্কে কোনো বিশদ গবেষণা করেন নি। নিউটনই প্রথম আকাশচারী গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি সম্পর্কীয় তথ্যাদি আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন।

নিউটন প্রমাণ করলেন যে সূর্য এবং অপর গ্রহের আকর্ষণী

শক্তি তাদের অন্তর্বর্তী দূরত্বের আনুপাতিক বর্গ অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়, অর্থাৎ যদি দূরত্ব দুই গুণ কমে যায় তবে আকর্ষণী শক্তি চার গুণ বৃদ্ধি পাবে এবং অপরদিকে দূরত্ব যদি তিন গুণ বেড়ে যায়, তবে আকর্ষণী শক্তি নয় গুণ কমে যাবে।

এই সূত্র অনুযায়ী বৈজ্ঞানিকরা পৃথিবীর চারপাশে চাঁদের এবং সূর্যের চারপাশে গ্রহদের আবর্তনের অর্থ ব্যাখ্যা করতে প্যারলেন, আরও পারলেন কোন সময়ে, কোনখানে, কি গতিতে তারা ঘুরছে সে বিষয়েও ব্যাখ্যা করতে। এই সব গাণিতিক ফলাফল সত্য বলে প্রমাণিত হল অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষে।

এরপর এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ রইল না যে মহাকর্ষ শক্তি আছে এবং তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি।

"অতএব পৃথিবীপৃষ্ঠেও কি আকর্ষণী শক্তি নেই? এবং এই শক্তি এবং পৃথিবীর মাধাকর্ষণ শক্তি একই বস্তু নয় কি"—এই প্রশ্ন তুললেন নিউটন।

কিন্তু যদি তাই হয় তবে অভিকর্ষ এবং মহাকর্ষ একই নিয়মের বশবর্তী হবে—অর্থাৎ দূরত্বের বর্গের অনুপাতিক এবং ভর অনুযায়ী তার পরিবর্তন হবে। চন্দ্রের গতি দেখে এর বিচার করা যেতে পারে—যদি চন্দ্র পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে আকৃষ্ট হয় তবে তাকেও ভূপৃষ্ঠে পড়ে যেতে হবে, যেমন কামান থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে কামানের গোলা পড়ে যায় পৃথিবীতে।

বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করলেন যে কামান থেকে অনুভূমিক

গতিপথে গোলা ছুঁড়লে, প্রথম সেকেণ্ডে কামান থেকে গোলাটা ৪·৯ মিটার বা ৪৯০০ মিলিমিটার বেঁকে যাবে, পরের সেকেণ্ডে আরও ৪·৯ মিটার বেঁকে যাবে এবং এমনিভাবে আরও বেঁকতে থাকবে।

ভূপৃষ্ঠের উপর অবস্থিত কোন প্রস্তর খণ্ড পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে যত দূরে, চন্দ্র পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে তার চেয়ে ষাট গুণ বেশী দূরে অবস্থিত। সুতরাং পৃথিবীপৃষ্ঠের কোন বস্তুকে অর্থাৎ একটা নুড়িকে যে শক্তি দিয়ে পৃথিবী আকর্ষণ করে, চন্দ্রকে আকর্ষণ করে তার থেকে ৩৬০০ ভাগ কম শক্তি দিয়ে।

যদি পৃথিবী থেকে চাঁদ পর্যন্ত একটা কামান নিয়ে যাওয়া হয় আর চন্দ্রের কক্ষপথে তার থেকে গোলা ছোঁড়া হয় তবে গোলাটা ৩৬০০ ভাগ কম বেঁকে পড়বে অর্থাৎ $\frac{৪৯০০}{৩৬০০}$ = ১·৩৫ ১·৩৬ মিলিমিটার বেঁকে পড়বে।

ঠিক এমনি ভাবেই চন্দ্র তার কক্ষে ভ্রমণ করছে, তার কক্ষ অনুযায়ী সরল রেখার পথে প্রতি সেকেণ্ডে ১·৩৬ মিলিমিটার বেঁকে যাচ্ছে। কিন্তু তফাৎ এই যে একটা সার্বিক আকর্ষণী শক্তি চন্দ্রের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করছে, আর গোলাটা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে শুধু মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা। এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে ভূমাধ্যাকর্ষণ শক্তি এবং সর্বজনীন আকর্ষণী শক্তি একই বস্তু।

যদি পৃথিবী পুরোপুরি গোলাকার হত, তাহলে বলের অনু-পাতেই তার ঘনত্ব হত এবং যদি আবর্তন না করত তাহলে তার পৃষ্ঠে যে কোনো স্থানেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সমান হত।

কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেছে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম যদিও পার্থক্যটা খুবই অল্প। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারের পর থেকেই এ সম্বন্ধে গবেষণা করা ভৌগলিক সমস্যার একটা বিশেষ বিষয় বলে গণ্য হয়ে উঠেছে।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তির পরিমাপ নির্ণয়

অত্যন্ত সংবেদনশীল স্প্রিংএর তুলাদণ্ডের সাহায্যে ১০০ গ্রাম ওজনের কোন জিনিস যদি পাহাড়ের চুড়োয় ওজন করা যায় তবে দেখা যাবে যে পাহাড়ের পাদদেশে ঐ জিনিসটার যা ওজন ছিল চুড়োর ওজন তার চেয়ে সামান্য একটু কম।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্বন্ধে গবেষণা করা হয় পতনশীল বস্তুর গতি পর্যবেক্ষণ করে। বলবিদ্যায় বল বলা হয় তাকে যার দ্বারা একটি বস্তু আর একটি বস্তুকে এমনভাবে প্রভাবান্বিত করে যে দ্বিতীয় বস্তুটির অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

যে বল বস্তুটিকে চলমান করেছে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বল কাজ করে, ততক্ষণ বস্তুটির গতিও বৃদ্ধি পায়। প্রতি সেকেণ্ডে এই গতি বৃদ্ধির নাম ত্বরণ।

একটি পতনশীল বস্তুর উপর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবকে পর পর দ্রুত কয়েকটি 'ধাক্কার' সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই সব 'ধাক্কার' ফলে পতনরত বস্তুটির গতি প্রতি সেকেণ্ডে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেক পরবর্তী সেকেণ্ডে বস্তুটি পূর্ববর্তী সেকেণ্ডের অপেক্ষা অধিকতর দূরত্ব অতিক্রম করে। আবার তৃতীয় সেকেণ্ডে

পূর্ববর্তী দ্বিতীয় সেকেণ্ডে অতিক্রান্ত দূরত্বের বেশি অতিক্রম করে এমনি ভাবে চলতে থাকে। এই গতিবৃদ্ধিকে বলা হয় স্বচ্ছন্দ পতনের ত্বরণ। এর পরিমাপ করা যায় পতনরত বস্তুটির প্রথম, দ্বিতীয় এই পরবর্তী সেকেণ্ড গুলিতে গতি নিরূপণ করে। কিন্তু এইরূপ বস্তুর গতি খুবই বেশী, সেজন্য ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকরা এর পরিমাপ করতে পারেন নি।

কিন্তু পতনরত বস্তুদের গতিসম্বন্ধীয় সূত্রগুলো খুবই প্রয়োজনীয়, যা বোঝা যায় দূরে কোনো কিছু উড়ে যাওয়ার হিসাব কষতে গেলে। কামান থেকে অনুভূমিক বা বাঁকাভাবে উপরদিকে গোলা যাবার পথে তা ক্রমাগতই নেমে পড়ে (৪নং ছবি)। কেমন করে কোনো কিছু পড়ে যায় তা না জানলে গোলাটা কতদূর যাবে এটা হিসাব করা সম্ভব নয়।
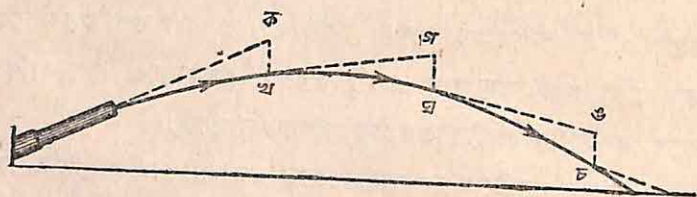
৪নং ছবি

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে গ্যালিলিওই প্রথম পতনশীল বস্তু নিয়ে পরীক্ষা চালালেন। তাঁর বাসস্থান ইতালীর পিসা শহরে একটা হেলানো গম্বুজ ছিল। ওর উপর থেকে ভারী জিনিসপত্র ফেলার খুব সুবিধা ছিল।

তরুণ বৈজ্ঞানিকটি পরীক্ষা শুরু করে দিলেন। গম্বুজের মাথায় ছোট্ট চৌকো জায়গাটা থেকে তিনি ফেলে দিলেন বিভিন্ন

ভারের লোহার বল কিংবা একটা কি ছুটো ইঁট। সব কটা জিনিসই একই সময়ে মাটিতে এসে পড়ল।

গ্যালিলিওর পরীক্ষার আগে সব বৈজ্ঞানিকদেরই ধারণা ছিল যত ভারী জিনিস হবে ততই তাড়াতাড়ি সেটা মাটিতে পড়বে। গ্যালিলিও এই বিশ্বাস ভুল বলে প্রমাণ করলেন। অবশ্য এটা ঠিক যে গ্যালিলিওর পরীক্ষায় দেখা গেল খুব ছোট আর খুব বড় পাথরগুলো পড়বার সময়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যের কারণ হল বড় পাথরের তুলনায় ছোট পাথরের উপর বাতাসের বাধা বেশী হওয়া। যদি বাতাসশূন্য কোনো জায়গায় পড়ে তবে একই সঙ্গে ছুটোই মাটিতে এসে পৌঁছবে।

বিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান পড়াবার সময় একটা সামান্য পরীক্ষার সাহায্যে এটা প্রমাণ করা হয়। একটা লম্বা কাঁচের ফাঁপা নলে পালক, কাগজের টুক্‌রো, শোলা আর সীসার টুকরো রাখা হয়। নলটা উল্টে ধরার সঙ্গে সঙ্গেই সীসার টুকরো আর শোলাটা অপর দিকে পড়ে যায়। কাগজের হাল্কা টুকরোগুলো অত তাড়াতাড়ি পড়ে না। আর পালকটা পড়ে অনেক পরে খুব আস্তে আস্তে।

কিন্তু যদি বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্রের সাহায্যে ঐ নলের মধ্যকার বাতাস বার করে নেওয়া যায় তাহলে সমস্ত ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় অন্য রকম—শুধু কাগজের টুকরোগুলিই নয় পালকটা পর্যন্ত সীসা আর শোলার সঙ্গে সঙ্গেই পড়বে। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় বাতাসের বাধাই কাগজের টুকরো এবং পালকটির

গতি কমিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রত্যেককেই সমান জোরে আকর্ষণ করেছে।

হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে—কেন সবকিছুরই আকর্ষণের জোর একই রকম হবে? অবশ্য যখন একটা ভারী পাথর কি বন্দুকের গুলি পড়ে তখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির পরিমাণ বেশী হয়, কিন্তু ত্বরণ একই থাকে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বুঝি বস্তুর বিভিন্ন ভরের জন্যই এই রকম হয়। যদি ভিন্ন ওজনের দুটি গোলা একই সঙ্গে ছোঁড়া হয়, তবে বারুদের শক্তি ওদের ভিন্ন ভিন্ন গতি দান করবে—যেটি দ্বিগুণ ভারী সেটি অর্ধেক জোরে যাবে। এটি নির্ভর করে বন্দুকটির বিস্ফোরণের শক্তি ও গোলার ভর অনুপাতে কিরকম বাধা পাবে তারই উপর।

যখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কোনো বস্তুকে মাটির দিকে আকর্ষণ করে তখন বস্তুটির ভরটা হয়ে দাঁড়ায় বাধা স্বরূপ। বস্তুটির ভর পতনের সর্বসময়েই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ত্বরণকে বাধা দেয়।

এ থেকে বোঝা যাবে কেন একটি ইঁট এবং একসঙ্গে বাঁধা দুটি ইঁট একই সঙ্গে উঁচু থেকে পড়ে। যদিও একটি ইঁটের উপর কার্যকরী মাধ্যাকর্ষণ শক্তির চেয়ে দুটি ইঁটের উপরে কার্যকরী মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বিগুণ বেশী কিন্তু ওদিকে যে দুটি ইঁট দ্বিগুণ বেশী বাধাও দান করছে।

কোনো বস্তুর ভর নির্ণয় করা যায় তার ওজন থেকে। কারণ ভর এবং ওজন আনুপাতিক। সাধারণত তুলাদণ্ডে বস্তুটিকে ওজন করা হয়। অবশ্য, একথা ভুললে চলবে না যে কোনো বস্তুর ওজন

অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রাকর্ষণী শক্তি পরিবর্তিত হবে ভূকেন্দ্র থেকে বস্তুটির দূরত্ব অনুযায়ী।

কোনো বস্তুর সম্পর্কে ভাবতে গেলে সেটির ভরের সঙ্গে আমাদের জানা কোনো ওজনের ভরের তুলনা করি। ধরা যাক তূলাদণ্ডে কোনো বস্তুর এক কিলোগ্রাম ওজন হল। সর্বত্রই সেই বস্তুটি ঐ ওজনের সমান হবে।

কিন্তু যদি স্প্রিঙের তূলাদণ্ডে ওজন নেওয়া হয় তবে দেখা যাবে ভূকেন্দ্র থেকে দূরত্বের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ওজনেরও তারতম্য হবে।

যদি পৃথিবীর কেন্দ্র হতে পৃথিবীর ব্যাসার্ধের ষাট গুণ বেশী দূরত্বে মহাশূন্যে আমরা যেতে পারি তবে দেখা যাবে ৩৬০০ গ্রাম ওজনের একটা পাথরের ওজন সেখানে হবে (৬০২) বা ৩৬০০ ভাগ কম; অর্থাৎ তার ওজন হবে মাত্র এক গ্রাম।

ইচ্ছা করলে খুবই সহজে আমরা পাথরটা আমাদের কড়ে আঙুলে ধরতে পারব, কিন্তু ওটাকে মহাশূন্যে ছুঁড়তে হলে পৃথিবীতে যেমন শক্তি দরকার মহাশূন্যেও তেমনিই শক্তি দরকার, কেননা হাতের শক্তিকে বাধা দিচ্ছে পাথরটির ভর, যা অপবর্তিত থাকবে মহাশূন্যেও। আর পাথরটি পৃথিবীতে থাকলে যেমন গতিবেগ পেত তেমনই গতিবেগ পাবে।

নানা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেছে কোনো বস্তুর ওজন পৃথিবীর সর্বত্রই সমান নয়। দেখা গেছে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি একই দ্রাঘিমারেখায় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম হচ্ছে— বিষুবরেখার যত কাছে আসা যায় আকর্ষণ ততই কম, মেরুর

কাছে আবার আকর্ষণ বেশী। অবশ্য এটা ঠিক যে এই পরিবর্তনটা সামান্যই। কিন্তু এই সামান্য পার্থক্যটাও বৈজ্ঞানিকরা পতনরত বস্তুর ত্বরণের তারতম্য দেখে নির্ণয় করেছেন

এখন দেখা যাক ঐ ভীষণ গতিসম্পন্ন বস্তুগুলোর পতনবেগ পৃথিবীতে কেমনভাবে নির্ণীত হয়।

ধরা যাক একটা বল সেন্টিমিটারে ভাগ করা একটা বিরাট উঁচু দেওয়ালের ধার দিয়ে পড়ছে। হাতে ঘড়ি নিয়ে প্রত্যেক সেকেণ্ডে ঐ বলটা কতখানি দূরত্ব অতিক্রম করছে তা বোঝা বড়ই শক্ত, কেননা বলটির গতিবেগ খুবই বেশি।

এই কারণেই অবাধে পতনরত বস্তু সম্বন্ধে গবেষণার অন্য পথ নিরূপণ করা হল।

বৈজ্ঞানিকরা কৌশলে বস্তুগুলোর পতনগতি কমিয়ে দিলেন। ধরা যাক দেওয়াল থেকে না ফেলে বলটা ফেলে দেওয়া হল একটা জলের নল বেয়ে। বলটা গড়িয়ে পড়বে আর তার গতিও হবে স্বচ্ছন্দ পতনের মতোই। এই পতন চোখেও দেখা যাবে, বোঝাও যাবে। কাজেই বলের এই গড়ানো দেখে স্বচ্ছন্দ পতন সম্পর্কে পরীক্ষা চালানো যাবে।

এইজন্য প্রয়োজন হল — হেলানো নল বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে বলটি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং পরবর্তী সেকেণ্ডগুলিতে কতটা পথ অতিক্রম করছে তা জানা।

এই গতিগুলো থেকে সহজেই হিসাব করা যাবে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে বলটির ত্বরণ কি পরিমাণে হচ্ছে।

বলের গড়ানোর গতি পরিবর্তন দেখে জলের নলের গতি অনুসারে পতনশীল বস্তুর ত্বরণও নির্ণয় করা যাবে।

গ্যালিলিওই এ ধরনের পরীক্ষা করলেন। যে কোনো কোণে হেলানো যায় এমন একটি সমতল দ্রব্যের গাত্রে তিনি খোদাই করলেন মসৃণ সরু খাত।

বলকে ঐ খাতে এমনভাবে আস্তে আস্তে গড়িয়ে দেওয়া হল যাতে বাতাসের বাধা না থাকে। এই হেলানো জায়গায় অল্পগতিতে বলটির গড়ানো লক্ষ্য করে গ্যালিলিও প্রতি সেকেণ্ডে বলটির দ্বারা অতিক্রান্ত দূরত্ব পরিমাপ করলেন। ঢালু জায়গাটির গতি অনুযায়ী তার অনুপাতে স্বচ্ছন্দ পতনশীল বস্তুর এক এক সেকেণ্ডে অতিক্রম্য দূরত্বও তিনি নিরূপণ করলেন।

কিন্তু যদি বৈজ্ঞানিকরা কেবলমাত্র হেলানো জলের নলের সাহায্যেই পতনশীল বস্তু সম্পর্কে গবেষণা চালাতেন তবে বিভিন্ন স্থানে যে পৃথিবীর বিভিন্ন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হয় তা বুঝতে পারতেন না। এই আবিষ্কার সম্ভব হল দোলকের সাহায্যে।

দোলকের সাহায্যে গবেষণার কথা বলবার আগে দোলকের সাধারণ ধর্ম সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন। সাধারণ দোলক হচ্ছে সরু সূতায় ঝুলন্ত একটা ভারী গোলক যা এপাশ থেকে ওপাশ দোলে। দোলকের ব্যবহার করতে হলে জানতে হবে কি কি অবস্থার উপর দোলকের একবার দোলন বা বৈজ্ঞানিক ভাষায় দোলকের পর্যায় নির্ভর করে। একটা সুতো দিয়ে একটা ছোট গোলক ঝুলিয়ে দিলে সহজেই দেখা যাবে যে সুতোর দৈর্ঘ্যের উপরই দোলনের পর্যায় নির্ভর করে।

দোলকের সুতো চার ভাগের একভাগ করে দিয়ে ঘড়ির সময় মিলিয়ে যদি দেখা যায় তা হলে দেখা যাবে যে দোলকের গতি দ্বিগুণ বেড়ে গেছে, অর্থাৎ দোলকের পর্যায় কমে গেছে দুই ভাগ। যদি সুতোটিকে নয় গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয় তবে দোলনের পর্যায়ও বেড়ে যাবে তিনগুণ।

কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তিরও বিরাট প্রভাব রয়েছে দোলনের পর্যায়ের উপর। এর কারণ বোঝা শক্ত নয়। ধরা যাক্, দোলকটি নিশ্চলভাবে ঝুলছে। ওটাকে নাড়িয়ে দিলেই এক ধারে ওটা উঠে পড়বে। যদি এবার ছেড়ে দেওয়া হয় ওটাকে, তবে দোলকের ভারে ওটা নেমে পড়বে। অবশ্য লম্বভাবে দোলক পড়ে না, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে বৃত্তচাপের আকারে ত্বরান্বিত হয় তার গতিবেগ। এর গতিও হেলানো নলের উপর বল গড়ানোর মতোই। যখন দোলকটির ভার তার কক্ষপথের নিম্নতম স্থানে এসে পড়ে তখন তার পতন বন্ধ হয়, কিন্তু জাড্যের প্রভাবে সেটি তখন বৃত্তচাপের আকারে অপর পাশে গিয়ে উপরে উঠতে থাকে। এরপর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দোলকের গতি যেমন প্রথমার্ধে ত্বরান্বিত করেছিল তেমনই তাকে মন্দীভূত করে।

এর অর্থ এই যে দোলনের গতি সুতোর দৈর্ঘ্য ছাড়াও নির্ভর করে পতনজনিত ত্বরণের উপর। অবশ্য হাল্কা বা ভারী বস্তু একই বেগে পড়ে। সেজন্যই সীসা এবং পালকের ওজনের দুটি দোলক একই দৈর্ঘ্যের সুতোর সাহায্যে দোলায়মান হলে একই বেগে দুলবে, অর্থাৎ দোলনের পর্যায় দোলকের ওজনের উপর নির্ভর করে না।

কিন্তু যদি কোনো উঁচু পাহাড়ের চুড়োয় ওঠা যায় তবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সেখানে দুর্বলতর হবে এবং স্বচ্ছন্দ পতনের ত্বরণও কম হবে। সুতরাং পাহাড়ের চুড়ায় দোলকও আরও আস্তে দুলবে।

এইভাবে আমরা দেখলাম দোলকের সাহায্যে মাধ্যাকর্ষণের পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বাড়ে দোলকও আরও জোরে দুলবে, যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কমে তবে দোলকও আরও আস্তে দুলবে।

দোলকের এই ধর্মের জন্য পৃথিবীপৃষ্ঠে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তারতম্য নির্ণয়ে এই যন্ত্রটি বিশেষভাবে উপযোগী এবং আবশ্যকীয় হয়ে উঠেছে।

পৃথিবীপৃষ্ঠে অভিকর্ষের পরিবর্তন

প্রথমে বৈজ্ঞানিকরা দোলকের সময় নির্ধারণ করলেন ঘড়ির সাহায্যে। সময়ের পরিমাপ ব্যবহারিক বিজ্ঞানের একটা মস্ত বড় বিষয়।

সময়ের পরিমাপ করা হয় ঘড়ির সাহায্যে, মিনিট এবং সেকেণ্ডের ভাগ হিসাবে। আরও বেশী সময় পরিমাপ করা হয় দিন এবং মাসের হিসাবে। মানুষের জীবনের পরিমাপ করা হয় বৎসরের হিসাবে।

সময়ের এই সব মান এল কোথা থেকে? এগুলো নিরপেক্ষ সম্বন্ধ নয়, নিয়মিত ব্যবধানে ঘটমান নৈসর্গিক কতকগুলো ব্যাপারের সঙ্গে এগুলো যুক্ত।

সূর্যই মানুষের প্রথম ঘড়ি। সকলেই জানে সারাদিনের মধ্যে গাছ, স্তম্ভ ইত্যাদির ছায়া কেমন পরিবর্তিত হয়ে যায়। সকাল বেলায় ছায়া থাকে খুবই বড়, যতই মধ্যাহ্ন এগিয়ে আসে ততই ছায়া হয়ে আসে ছোট। এ ছাড়াও ছায়ার দিকও পরিবর্তিত হয়।

এর অর্থ এই যে সমতল ভূমিতে কোন স্তম্ভের ছায়া বিচার করে সময় নির্ণয় করা সম্ভব। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার গতি পরদিন সূর্যোদয় পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়। ছায়ার শীর্ষটিই সূর্যের গতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়ে ঘড়ির কাজ করে।

এ কথা বেশ স্পষ্ট যে এই ক্ষেত্রে আমরা পৃথিবীর আবর্তনের গতি অনুযায়ীই সময় পরিমাপ করি। কারণ দৃশ্যত সূর্যের গতি পৃথিবীর আবর্তনেরই প্রতিচ্ছবি।

দোলকের গতি সম্পর্কীয় সূত্রগুলি আবিষ্কৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ির প্রচলন হল দোলকের গতি অনুসারে। প্রথম ব্যবস্থাটির কৌশল হল এই: দোলকের দোলনের ফলে দোলকের সঙ্গে সংযুক্ত একটি ওজনের পতন হল; আবার ঐ দোলন থেকেই দোলকটি তার দোলন অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য শক্তি লাভ করল।

সূর্যের সঙ্গে একটি ঘড়িকে নিয়ন্ত্রিত করে বৈজ্ঞানিকরা এই স্থির বিশ্বাসে এলেন যে দোলক ভূপৃষ্ঠের যে কোন স্থানে তার দোলন অব্যাহত রাখবে, যদি দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকে।

কিন্তু দেখা গেল বৈজ্ঞানিকদের ভুল হয়েছে। একটি নতুন আবিষ্কার তাঁদের পথ দেখিয়ে দিল। এক বৈজ্ঞানিক পারী থেকে কায়েন (দক্ষিণ আমেরিকার নৈসর্গিক অঞ্চল) পর্যন্ত পাড়ি দিতে গিয়ে দেখলেন যে তাঁর ঘড়ির দোলকের দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও তাঁর ঘড়ি প্রকৃত সময়ের পশ্চাদ্বর্তী হয়ে গেল।

এই রহস্যের কারণ এই যে দোলকের দোলন-গতি কেবল তার দৈর্ঘ্যের উপরই নির্ভরশীল নয়, অভিকর্ষের প্রভাবও তার উপর আছে। যখন দোলকের দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিতই রয়েছে তখন নিশ্চয়ই বিষুবঅঞ্চলে অভিকর্ষ দুর্বলতর।

তাহলেই দোলকের দোলনকাল বেশি হবে এবং ঘড়িও প্রকৃত সময়ের পশ্চাদ্বর্তী হবে। সপ্তদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের

কাছে এই আবিষ্কার বড়ই অদ্ভুত ঠেকেছিল। পৃথিবীর কেন্দ্রাকর্ষী শক্তির তারতম্যই এই ব্যাপারটির কারণ তা তাঁরা তৎক্ষণাৎ মেনে নিতে পারেন নি।

প্রথমে বৈজ্ঞানিকরা মনে করলেন ঘড়ির এই পিছিয়ে থাকার কারণ দক্ষিণের গরম। অবশ্য এই ঘড়ির দোলকপিণ্ডটি সুতোয় ঝোলানো না হয়ে ধাতব দণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল।

মেরুদেশে যেখানে কোন বস্তুই অক্ষপথে ঘোরে না সেখানে এই "কেন্দ্রাতিগ শক্তির" প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু মেরু অঞ্চল থেকে যতই দূরে যাওয়া যাবে, বস্তুটিকে ততই বৃহত্তর বৃত্তে ২৪ ঘণ্টায় ঘুরতে হবে। বস্তুটির গতিও ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে এবং "কেন্দ্রাতিগ শক্তিও" ততই বেশি হবে। বিষুবরেখায় এই শক্তি হবে চরম। এখানে প্রত্যেক বস্তুই এই "কেন্দ্রাতিগ শক্তির" ফলে ১/২৮৯ ভাগ কম ভারী হবে মেরুদেশের ভার অপেক্ষা।

বিষুবরেখার উত্তরে ও দক্ষিণে ভারের এই হ্রাস অত্যন্ত সামান্য। কিন্তু ভার যে কমে যায় তা ঠিক। এই কারণেই বিষুবরেখার কাছে দোলকের দোলনও হয় আস্তে আস্তে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যে শক্তির বলে সকল বস্তুই পৃথিবীর উপর এসে পড়ে তার দুটি অংশ—পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি, এবং "কেন্দ্রাতিগ" শক্তি। এই দুই শক্তির মিলিত ফলকেই বলা যেতে পারে অভিকর্ষ।

কিন্তু কেবলমাত্র এরই সাহায্যে বিষুবরেখার উত্তরে ঘড়ির সময়ের ক্রম-পরিবর্তনের পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া চলে না। দোলকের সাহায্যে দেখা গেছে যে বিষুবরেখার উপর অভিকর্ষ বস্তুটির ভরের

প্রায় ১/১৯০ ভাগ কম থাকে; অর্থাৎ অভিকর্ষ কেবলমাত্র "কেন্দ্রাতিগ শক্তি" ছাড়াও কিছুটা বেশি কম হবে।

এই পার্থক্যটুকু কেমনভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? এর অর্থ এই যে আরও কোনো কারণ আছে যার জন্য বিষুবরেখা অঞ্চলে অভিকর্ষ কম হয়।

নিউটন দেখিয়েছেন অভিকর্ষের এই দুর্বলতার কারণ হচ্ছে পৃথিবীর প্রান্তিক সঙ্কোচন।

যেহেতু পৃথিবীর মেরুদেশ কিঞ্চিৎ চাপা সেইহেতু ঐ অঞ্চলে যে কোনো বস্তুই নৈসর্গিক অঞ্চলের কোনো বস্তুর চেয়ে ভূকেন্দ্রের নিকটতর। সেই কারণেই মেরুপ্রদেশে অভিকর্ষ বিষুবরৈখিক অঞ্চলের চেয়ে বেশি।

সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম, কেন একটা ঘড়িকে পারী থেকে বিষুবরেখা অঞ্চলে নিয়ে এলে সেটা প্রকৃত সময়ের থেকে পেছিয়ে থাকবে।

ভূপৃষ্ঠের যে কোনো স্থানে অভিকর্ষ নির্ণয় করতে হলে অত্যন্ত সংবেদনশীল স্প্রিং তুলাদণ্ড ব্যবহার করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় মেরুদেশে ১৯০ গ্রাম ওজনের বালির ভার একই তুলাদণ্ডে বিষুবরেখা অঞ্চলে হবে মাত্র ১৮৯ গ্রাম। এই উপায়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একই ওজনের বস্তু ব্যবহার করে অভিকর্ষের পার্থক্য নিরূপণ করা যাবে।

কিন্তু এই সবের পরিবর্তে বৈজ্ঞানিকরা স্বচ্ছন্দভাবে পড়ন্ত একটি বস্তুর ত্বরণ নির্ণয় করতেই বেশী পছন্দ করেন; কারণ সেটা হচ্ছে অভিকর্ষের আনুপাতিক।

একটি দোলকের দোলন লক্ষ্য করে পৃথিবীর যে কোন স্থানে পতনজনিত ত্বরণের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

ধরা যাক পাঁচ মিনিটে দোলকটির দোলন কতবার হল তা লক্ষ্য করা হল এবং তারপর তার দোলনকাল গণনা করা হল।

যদি দোলকটি পাঁচ মিনিটে ৬০০ বার দোলে তবে একটি দোলনের কাল হচ্ছে $\frac{১}{২}$ সেকেণ্ড।

দোলনকাল এবং দোলকের দৈর্ঘ্য থেকে একটি সামান্য সূত্রের সাহায্যে স্বচ্ছন্দ পতনের ত্বরণের তারতম্য এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিকর্ষের পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যাবে।

কিন্তু দোলকের সাহায্যে গণনা অপেক্ষা এই গণনা কিছুটা পৃথক হবেই।

এর দ্বারা প্রমাণ হয়, সমুদ্র এবং অন্যান্য স্থানের জলভাগ মহাদেশব্যাপী খালের দ্বারা সংযুক্ত হলেও পৃথিবীর আকার সুষম উপবৃত্তের মতো ঠিক নয়।

দোলকের দোলন বহু অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাপে এর দৈর্ঘ্য পরিবর্তিত হয়। বাতাসের বাধা এবং দোলকপিণ্ডের সংযুক্তির স্থানে ঘর্ষণজনিত বাধা এর গতি নিয়ন্ত্রিত করে। এমনকি বায়ুর চাপও দোলনকে প্রভাবান্বিত করে।

প্রত্যেকটি পরীক্ষার এবং গণনা করবার জন্য বহু সময় লাগে। কিন্তু, দোলকের সাহায্যে অভিকর্ষ নির্ণয়ের পন্থাটি এখনও পর্যন্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে।

কেবলমাত্র গত দশ বছর ধরে অন্যান্য যন্ত্রের অর্থাৎ গ্র্যাভিমিটারের ব্যবহার চলছে অভিকর্ষ নির্ণয়ের জন্য। গ্যাস

গ্র্যাভিমিটারের কল্পনা করেন এম, ভে, লামানসফ। তিনি তার নাম দেন বিশ্বজনীন চাপমান যন্ত্র।

গ্র্যাভিমিটারের মূল তত্ত্ব হচ্ছে এই : অভিকর্ষের পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে সংনমিত গ্যাসের উপর পারদস্তম্ভের চাপও পরিবর্তিত হয়। এই চাপের পরিমাণ এবং তা থেকে অভিকর্ষের পরিমাণও নির্ণয় করা যায়।

গ্র্যাভিমিটার অন্যান্য ব্যাপারেও কাজে লাগে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ভারের অনুপাতে স্প্রিংএর তারতম্য নিরূপণ করার ব্যাপারে।

দোলকের সাহায্যে বৈজ্ঞানিকদের আরও একটি কাজ হয়েছে। এর দ্বারা তাঁরা সূর্য এবং চন্দ্রের আকর্ষণে পৃথিবীর আকারের পরিবর্তন লক্ষ্য করতে সক্ষম হয়েছেন।

পৃথিবীর আকারের পরিবর্তন

পৃথিবীর আবর্তনের ফলে মেরুপ্রান্তে পৃথিবীপৃষ্ঠ হয়েছে কিঞ্চিৎ চাপা। ধীরে ধীরে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে একটা সমতা এল। অবশ্য, এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর আকার আমাদের অজ্ঞাতসারেই পরিবর্তিত হচ্ছে নানা শক্তির প্রভাবে—যেমন, চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ এবং "কেন্দ্রাতিগ শক্তির" ফলে।

কেমন করে এই সব শক্তি পৃথিবীর আকারের পরিবর্তন ঘটাতে পারে তা বোঝা যায় ভূপৃষ্ঠের শতকরা ৭১ ভাগ অধিকার করে যে বিরাট জলরাশি রয়েছে তার উপর এদের প্রভাব দেখে।

মনে করা যাক পৃথিবীর আবর্তনের গতি হঠাৎ বেড়ে গেল। তাহলে কি হবে ?

বিষুবরেখাসংলগ্ন অঞ্চলে পৃথিবীর গতিবেগ বৃদ্ধির জন্য জলভাগে বিশাল আলোড়ন দেখা দেবে এবং বর্ধিত "কেন্দ্রাতিগ শক্তির" বলে অন্যস্থানের জলরাশি ঐ অঞ্চলে চলে এসে স্থলভাগকে নিমজ্জিত করবে। সৌভাগ্যবশত আবর্তনের গতির এরূপ বিশেষ পরিবর্তন হয় না।

আবর্তনের গতির সামান্য পরিবর্তন যা পরিলক্ষিত হয় তার প্রভাবে সমুদ্র পৃষ্ঠের খুব একটা পার্থক্য দেখা যায় না।

পৃথিবীর আবর্তনের তারতম্যের সঙ্গে সঙ্গে তার আকারও রূপান্তরিত হবে।

মেরুপ্রান্তে সঙ্কোচন এবং নৈসর্গিক এলাকায় স্ফীতি ঘটতে বহু সময় লাগবে একথা যেমন সত্য, তেমনই পৃথিবীর গতি বৃদ্ধি হলে এই পরিবর্তন ঘটতেও বাধ্য।

এমন কি সামান্যতম অবস্থান্তর যা বৈজ্ঞানিকরা লক্ষ্য করেন তার প্রভাবও কিছুটা পরিলক্ষিত হয় পৃথিবীর আকারের উপর।

প্রকৃতিগত আরও কয়েকটি কারণ আছে যার দ্বারা পৃথিবীর আকারের রূপান্তর ঘটে।

পৃথিবী সৌরজগতেরই একটি গ্রহ। এর উপর চন্দ্র, সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহের আকর্ষণের ক্রিয়া হচ্ছে। সব চেয়ে বেশি প্রভাব কিন্তু চন্দ্রের, কারণ মহাশূন্যে এটিই আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী।

চন্দ্রের আকর্ষণের ক্রিয়া পৃথিবীর প্রত্যেক কণাটির উপরেও হয়। লোকে বহুযুগ আগেই এ ব্যাপার লক্ষ্য করে ছিল। জোয়ার ভাঁটা দেখে, পর্যায়ক্রমে সমুদ্রতীরে জল পৃষ্ঠের ওঠানামা থেকে তা বুঝতে পেরেছে।

কৃষ্ণ সাগর কিম্বা বাল্টিক সাগরের তীরে কিন্তু জোয়ার প্রায় দেখাই যায় না। ২৪ ঘণ্টায় এখানকার জলরাশির উচ্চতা প্রায় অপরিবর্তিত থাকে কারণ চতুর্দিকে ঘেরা এই সাগর দুটিতে জলের পরিমাণ খুবই কম।

ভূমধ্য সাগরে জোয়ার ভাঁটা দুইই দেখা যায়, কিন্তু সমুদ্রের তুলনায় কম।

যখন জোয়ারের সময় জল বাড়ে তখন ঢেউগুলো আছড়ে পড়ে তীরের উপর। সমুদ্রে যে সব নদী এসে পড়েছে তাদের জল

ঠেলা পেয়ে উঁচু হয়। মোহানা থেকে অনেক দূর পর্যন্ত নদীতে এই দৃশ্য দেখা যায়।

জোয়ার কখন আসবে এবং তার উচ্চতা কত তা নাবিকদের জানতে হয়। এই কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের জোয়ার-ভাঁটার সম্ভাব্য সময় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে অনেক হিসাব-নিকাশ করে।

বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি বহুদিন ধরেই আকৃষ্ট হয়েছিল জোয়ার-ভাঁটার দিকে। তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন চন্দ্রের দৈনিকগতির পরই একটা জোয়ার হয় যদিও কখন কখনও কয়েক ঘণ্টা দেরিও হতে পারে। জলকণার ঘর্ষণের জন্যই এই রকম দেরি হয়।

জোয়ার ভাঁটার কারণ বিশ্লেষণ করা বড়ই শক্ত। মহাকর্ষের সূত্রাবলী আবিষ্কৃত হবার আগে পর্যন্ত কোনো পণ্ডিতই এই সমস্যার ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। মহাকর্ষের সূত্র আবিষ্কারের পরই সম্ভব হল জোয়ার ভাটার রহস্যের সমাধান। প্রমাণিত হল যে জলরাশির এই বিরাট আলোড়নের সঙ্গে মহাশূন্যে পৃথিবী ও চন্দ্রের গতির সম্বন্ধ আছে এবং চন্দ্রের দ্বারা সাগর জল আকৃষ্ট হওয়াই এর কারণ। পৃথিবীর যে অংশ চন্দ্রের সম্মুখীন থাকে সেখানকার জলরাশির উপর চাঁদের আকর্ষণ খুব বেশি হয়। ভূকেন্দ্র চন্দ্র থেকে অধিকতর দূরে থাকায় সেখানে আকর্ষণ কম, ফলে চন্দ্রের দিকে ত্বরণও কম। চন্দ্রের বিপরীত দিকের জল-রাশির উপর আকর্ষণ আরও কম হয়, এবং যেহেতু ঐ জলরাশি পৃথিবীর পিছন দিকে রয়েছে সেইজন্য এই জলরাশি অপেক্ষা পৃথিবী চন্দ্রের দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়। কাজেই দেখা যায় যে পৃথিবীর যে জায়গাটা চাঁদের সবচেয়ে কাছে ও যে জায়গাটা

সবচেয়ে দূরে—এই দুই জায়গাতেই সমুদ্রের জলরাশিতে জোয়ারের সৃষ্টি হয়।

পৃথিবীর আবর্তনের ফলে এইরকম মনে হয় যে চন্দ্র পৃথিবীকে দৈনিক একবার প্রদক্ষিণ করে। জোয়ারও হয় সেই-ভাবেই। বিপরীত দিকেও জোয়ার এমনিভাবেই সরে সরে যায়।

কিন্তু আকর্ষণের প্রভাব শুধু সমুদ্রের জলরাশির উপরই পড়ে তা নয়, সমস্ত পৃথিবীতেই আকর্ষণের ফল দেখা যায়। কিন্তু অচল কঠিন স্থলভূমি অপেক্ষা সচল জলরাশির উপর টানটা বুঝা যায় স্পষ্ট। জলরাশি স্থলভাগের উপর দিয়েই স্থান পরিবর্তন করে।

এখন ধরা যাক পৃথিবীটা যদি ছোট ছোট টুক্‌রো দিয়ে গঠিত হত, অর্থাৎ টুক্‌রোগুলো যদি জোড়া না থাকত তাহলে কি হত। তাহলে জোয়ারের প্রভাবে অনেক স্থলভাগই ধুয়ে যেত। চন্দ্রের দৈনিক গতি অনুসারে জোয়ারও চল্‌ত।

যদি শূন্যের কোনো স্থান থেকে পৃথিবীকে আমরা দেখতে পেতাম তাহলে দেখতাম যে পৃথিবীর আকার অনবরত পালটেই যাচ্ছে, চন্দ্রের গতির সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের দিকে প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীটা।

অবশ্য এই পরিবর্তনটা বেশি নয়। পৃথিবীর ব্যাস মাত্র ১৬০—১৮০ সেন্টিমিটার বেড়ে যায় এমনিভাবে। পৃথিবীর উপরকার শক্ত, প্রায় ১০ কিলোমিটার পুরু আবরণের কোনো পরিবর্তন হয় না। কিন্তু ভিতর থেকে চাপের ফলে অনেকটা পাতলা রবারের পর্দার মতো ওটা সামান্য বেঁকে যায়। ঐ

পুরু শক্ত আবরণের উপর থেকে ভূপৃষ্ঠের উপর লম্বসূত্রের অবস্থান আমরা দেখতে পাবনা।

কিন্তু যদি পৃথিবীর আকারের কোনো পরিবর্তন না হয় তবে লম্বসূত্রের নতি দেখা যাবে। গণনায় দেখা যায় ১২০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের একটা লম্বসূত্রের নতি হবে ১ সেন্টিমিটার। যদি এরকম একটা লম্বসূত্র খাড়া করা যায়, তবে দেখা যাবে চন্দ্রের দৈনিক গতি অনুসারে ২৪ ঘণ্টায় বেশ অদ্ভুত একটা সঞ্চার-পথ তৈরি হবে।

অবশ্য ১২০ কিলোমিটার উঁচু থেকে কোনো লম্বসূত্র ঝোলানো প্রায় অসম্ভব।

তাই বৈজ্ঞানিকরা তৈরি করলেন এমন একটা খুব সংবেদনশীল যন্ত্র যার দ্বারা অনেক বড় লম্বসূত্রের স্থান পরিবর্তন দেখা যাবে। এই যন্ত্রের সাহায্যে রুশীয় বিজ্ঞানী আ, ইয়া, অর্লফ উরেভ শহরের (বর্তমানে তারতা) মানমন্দিরে কয়েকটা বিষয় লক্ষ্য করলেন। তিনি প্রমাণ করলেন যে ২৪ ঘণ্টায় লম্বসূত্রের স্থান পরিবর্তনের অঙ্ক পৃথিবীর অপরিবর্তনীয় অবস্থার তুলনায় কিছুটা কম। এর অর্থ এই যে, পৃথিবী কঠিন হলেও চন্দ্র এবং সূর্যের আকর্ষণে তার আকারের কিছু পরিবর্তন হয়। চন্দ্রের আকর্ষণে পৃথিবীর কঠিন আবরণও জোয়ারের ঢেউএর মত কিছুটা উঁচু হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিকদের গণনায় দেখা গিয়েছে যে এই উচ্চতার পরিমাণ সমুদ্রের একটা ঢেউ এর উচ্চতার $\frac{1}{3}$ অংশ।

ঘণ্টাছয়েক অন্তর পৃথিবীর ত্বকের এই যে ওঠানামা হয় তা কিন্তু আমরা দেখতে পাই না। জাহাজে উঠে খোলা সমুদ্রে

জোয়ারের সময় জলের উঁচু হওয়াটা যেমন বোঝা যায় না তেমনি এটাও বোঝা যায় না। জাহাজও ওঠে জলের সঙ্গে সঙ্গে, কাজেই তা উপলব্ধি করা যায় না।

তীরের কাছে জোয়ারের সময় জলের উঁচু হয়ে উঠা বোঝা যায়, কেন না তীর হচ্ছে স্থির।

কিন্তু আগেই আমরা বলেছি সমুদ্রের তীর এবং তলদেশও আকর্ষণ শক্তির টানে উঁচু হয়, যদিও তা জলের চেয়ে কম। এই কারণেই জোয়ারের উঁচু জল প্রকৃত উচ্চতার থেকে আমাদের কাছে কম উঁচু মনে হয়।

হিসাব করে দেখা গেছে সমুদ্রে জলের উচ্চতা প্রায় ০·৮—০·৯ মিটার হতে পারে, যদিও আসল উচ্চতা থেকে ০·২০—০·২৫ মিটার কম।

পৃথিবীর ত্বকের এই ফেঁপে ওঠা থেকে সমস্ত পৃথিবীর কঠিনতারও একটা ধারণা করা যায়।

শুধু পৃথিবীর কঠিনতার পরিচয়ই পাওয়া যায় না, পৃথিবীর স্থিতিস্থাপকতাও কত বেশি তা জানা যায়—পৃথিবীর কঠিন আবরণের যে ফেঁপে ওঠা তাও চন্দ্রের আকর্ষণ কমে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার সহজ অবস্থায় ফিরে আসে।

আকর্ষণের ফলে পৃথিবী অনবরত তার আকার পরিবর্তন করছে। চাঁদের দিকে ফুলে উঠছে। কিন্তু এই আকর্ষণী শক্তি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার পৃথিবী দুই প্রান্তে চাপা গোল রবারের বলের মতোই পূর্বের আকার ধারণ করছে।

পৃথিবীর আবর্তন

আমরা আগেই বলেছি, পৃথিবীর আবর্তনের কথা ষোড়শ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হলেও তা প্রমাণিত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীর আবর্তন বুঝতে পারা যায় না কিন্তু ভূপৃষ্ঠের উপরের বস্তুগুলির গতির মধ্যে পৃথিবীর আবর্তনের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যাক, যদি একটা বল উঁচু মিনার থেকে ফেলা যায় তবে ওটা খাড়া না পড়ে পূর্বদিকে একটু হেলে পড়বে। এর কারণ মিনারের উপরে থেকে ছোট বলটা পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পূর্বে যাওয়ার জন্য মিনারের পাদদেশ থেকে বেশি তাড়াতাড়ি সরে যাচ্ছে। পড়বার সময় খানিকটা ভূপৃষ্ঠ থেকে এগিয়ে যাচ্ছে।

এই কারণেই ছোট বলটা খাড়াভাবে না পড়ে একটু বেঁকে যাচ্ছে পূর্ব দিকে। অবশ্য এই বেঁকে যাওয়ার পরিমাণ এমন কিছু বেশি নয়। উদাহরণস্বরূপ, মস্কোর ক্রেমলিনে মহামতি ইভানের নামের ঘণ্টাওলা গম্বুজ থেকে পড়লে বলটা পূর্বদিকে নয় মিলিমিটারেরও কমই বেঁকে যাবে।

গত শতাব্দীর প্রথমে এই পরীক্ষার দ্বারা পৃথিবীর আহ্নিক গতি প্রমাণিত হয়েছিল পরিষ্কারভাবে। পরে, ঐ শতাব্দীর মাঝামাঝি আরও অদ্ভুত আর একটি সত্য পরিলক্ষিত

হল। পরীক্ষার দ্বারা জানা গেছে দোলক তার দোলনের দিক অপরিবর্তিত রাখতে চেষ্টা করে। সকলেই এটি পরীক্ষা করে দেখতে পারে।

কোন সরু সুতো বেঁধে একটা বল্টু বা সীসার গুলি একটা দণ্ড থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। এমনভাবে ঝুলিয়ে দেওয়া হল যাতে দোলন-বিন্দুর ঠিক আড়াআড়ি এক কাল্পনিক অক্ষপথে সেটা ঘুরতে পারে।

যন্ত্রটি ঘুরছে বলে দোলকের দোলনের দিক নির্দিষ্ট থাকবে। এখন কল্পনা করা যাক, একটা লম্বা, ভারী দোলক ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে কয়েক ঘণ্টার জন্য মেরুদেশ থেকে। এই দোলক দোলনের দিক এবং তল পরিবর্তন করবে না এবং তার তলায় পৃথিবী ঘুরবে।

ঘূরন্ত পৃথিবীর উপরে যদি কোনো পর্যবেক্ষক থাকে তার মনে হবে দোলনের তল বুঝি ঘুরে যাচ্ছে নক্ষত্রদের দৈনিক গতির সঙ্গে সঙ্গে। মেরুপ্রদেশ আর নিসর্গীয় অঞ্চলের মাঝামাঝি জায়গায় ফরাসী পদার্থবিদ ফুকো উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এইরূপ পরীক্ষা করেন।

একালে, লেনিনগ্রাদের ইসাকিয়েভ্স্কি মঠে ৯৮ মিটার লম্বা একটি দোলক তৈরি করা হয়। ফুকোর পরীক্ষাস্থল পারীর চেয়ে লেনিনগ্রাদ মেরুর অনেক কাছে হওয়ায় দোলন তলের নতি আরও বেশি হয়েছিল সেখানে। কাজেই, পৃথিবী যে আবর্তনশীল একটা গোলক সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। ঠিক ঘুরন্ত লাট্টুর মতোই পৃথিবী ঘোরে। লাট্টুর আকার

শঙ্কুর মতো। তার মাথা এবং তলা দিয়ে চলে গেছে তার অক্ষপথ। এই অক্ষপথের চারদিকে টেবিলের উপর লাট্টুটি ঘোরে মাথাটা একটু বেঁকিয়ে। এর কারণ জাড্য।

অভিকর্ষ চেষ্টা করছে লাট্টুকে টেবিলের উপর শুইয়ে দিতে। কিন্তু ঘুরন্ত গতির জন্য লাট্টু তার অক্ষপথের চারদিকেই ঘুরছে। অভিকর্ষের ফলে টেবিলের উপর যে কোণ গঠিত হচ্ছে লাট্টুর অক্ষপথের সঙ্গে তা অপরিবর্তিত থেকে যায় যতক্ষণ না লাট্টুর গতি কমে আসে।

যদি কোন বহিঃশক্তি পৃথিবীর স্থান পরিবর্তন করতে চেষ্টা করে তাহলে পৃথিবীর গতিও এইরকমই হবে। সূর্য এবং চন্দ্রের আকর্ষণ অনেকটা এইরূপ শক্তির কাজ করে।

আগেই আমরা বলেছি পৃথিবী মেরুপ্রদেশে চাপা এবং বিষুবরেখা অঞ্চলে স্ফীত। মনে করা যেতে পারে পৃথিবী একটা গোলাকার বস্তু, যার মাঝখানে বিষুবরেখার জায়গায় রয়েছে একটা ভারী মণ্ডল।

যদি এই মণ্ডল চন্দ্রের কক্ষপথে (শূণ্যে কোন গ্রহ উপগ্রহের গতিপথ) অবস্থিত হত তাহলে পৃথিবীর আবর্তনের অক্ষপথের উপর চন্দ্রের কোনো প্রভাব এসে পড়ত না।

কিন্তু এই মণ্ডল চন্দ্রের কক্ষপথের তলের দিকে কিছুটা নত কাজেই চন্দ্র আকর্ষণ করছে তাকে। সুতরাং পৃথিবীর অক্ষপথ সরে যাওয়া উচিত।

কিন্তু ঘুরন্ত লাট্টুর মতোই পৃথিবীও তার অক্ষপথ পরিবর্তনে বাধা দেয়। সেইজন্য চন্দ্র এই মণ্ডলকে আকর্ষণ করতে

পারছে না, কিন্তু পৃথিবীর অক্ষকে বাধ্য করছে এমন করে ঘুরতে যাতে মহাশূন্যে একটা শঙ্কুর সৃষ্টি হয় যার শীর্ষদেশ হচ্ছে ভূকেন্দ্রে।

জ্যোতির্বিদরা অনেক আগেই পৃথিবীর এই গতি লক্ষ্য করেছিলেন।

আবর্তনরত পৃথিবীর অক্ষকে যদি কল্পনায় বাড়িয়ে নেওয়া যায় তাহলে তা মেরুদেশের উপর হেলে থাকবে।

একটা শঙ্কুর আকারে পৃথিবীর অক্ষের আবর্তনের ফলে আকাশে মেরুদেশের কক্ষপথ বৃত্তাকার হয়েছে। এখন ধ্রুব-নক্ষত্রের কাছে এই বৃত্ত কিন্তু ১২,০০০ বছর পরে উত্তর আকাশের উজ্জ্বলতম তারা অভিজিতের কাছে আসবে সেটি এবং ১৩,৭০০ বছর পরে আবার ফিরে আসবে ধ্রুব নক্ষত্রের কাছে।

পৃথিবী একটা বিরাট লাট্টু। লাট্টুর ক্ষেত্রে অক্ষপথের শঙ্কুর উপরে যে ভ্রমণ সম্পূর্ণ করতে লাগে মাত্র এক সেকেণ্ড, তা করতে পৃথিবীর অক্ষপথের লাগবে ২৫,৭০০ বছর।

পৃথিবীর অক্ষের এই একমাত্র গতি নয়। এর আরও অনেক গতি আছে যা লাট্টুর মধ্যেও দেখা যায়।

পৃথিবীর উপাদান

পৃথিবীর এই ভয়ানক কঠিনতার কারণ কি? পৃথিবীর উপরটা কি দারুণ শক্ত আর মোটা এক আবরণে ঢাকা? না কি, সমস্ত পৃথিবীটাই একটা শক্ত কিছু জিনিস দিয়ে তৈরি? ভূপৃষ্ঠে আমরা যা দেখি তার থেকেই পৃথিবীর উপাদান সম্বন্ধে আমাদের যতটা সম্ভব জ্ঞান হয়েছে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে ৫-৬ কিলোমিটার পর্যন্ত খোঁড়া হয়েছে। দেখা গেছে ঐ গভীরত্বে উত্তাপ ১০০ ডিগ্রিরও বেশি।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে ক্রমশ উত্তাপ বৃদ্ধির জন্য ২·৫—৩·০ কিলোমিটারের নীচে কোনো যন্ত্রপাতি চালাতে অসুবিধা হয়।

পৃথিবীর উপর দিকে সাধারণত প্রতি ৩০-৫০ মিটার পর এক ডিগ্রি করে উত্তাপ বাড়ে। কিন্তু কোথাও কোথাও (যেমন, কামস্কাটকা এবং উত্তর ককেশাসের প্রস্রবণ অঞ্চলে) উত্তাপের বৃদ্ধির পরিমাণ আরও বেশি। আবার কোথাও কোথাও (যেমন, ডন-নদীর অববাহিকার দক্ষিণ দিকে) ঠিক এর বিপরীত, উত্তাপ বেশ কম।

এখনও পর্যন্ত ৬ কিলোমিটারের পর কতটা দূরত্বে কত উত্তাপ বাড়বে তা জানা যায় নি। অবশ্য, আগ্নেয়গিরির গরম তরল লাভা থেকে প্রমাণিত হয় যে ২০-৩০ কিলোমিটার গভীরত্বে উত্তাপ খুব বেশি। গলিত লাভার উত্তাপ প্রায় ১০০০ ডিগ্রি।

এর অর্থ এই যে লাভা যে গভীরত্ব থেকে আসছে সেখানের শিলার উত্তাপ ঐ তাপের চেয়ে কম নয়।

এই সব থেকে মনে হয় যেন পৃথিবীর অভ্যন্তর গলিত অবস্থায় রয়েছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকরাও এই রকমই মনে করেছেন। কিন্তু এখন এই মত বর্জন করা হয়েছে—বিজ্ঞানের প্রাপ্ত তথ্য বিচার করলে মনে হয় পৃথিবীর অভ্যন্তর কঠিন।

কঠিন পদার্থ তাকেই বলা হয় যার প্রতিটি কণা পদার্থটির আয়তন অক্ষুণ্ণ রাখে এবং কণাগুলি গতিবিরোধী। যেমন ধরা যাক, কোন ধাতব পদার্থ।

যদি আমরা একটি ধাতব ঘনবস্তুর আকার পরিবর্তিত করতে চেষ্টা করি তাহলে এর প্রতিটি কণা হতেই আমরা বাধা পাব।

কিন্তু তরল পদার্থের কণাগুলো (যেমন জল কি গলিত ধাতু) এত বেশি গতির বিরোধী নয়। এই কারণেই যে কোনো তরল পদার্থ পাত্রের আকারই ধারণ করে। কিন্তু, কঠিন, কি তরল, সব পদার্থই আয়তন পরিবর্তনের বিরোধী।

বর্তমানে অনেকের ধারণা পৃথিবীর অভ্যন্তরে কোনো স্থানের উত্তাপই ২০০০-২৫০০ ডিগ্রির বেশি নয়। একথা ঠিক যে ঐ উত্তাপে ভূপৃষ্ঠে সমস্ত শিলা গলিত অবস্থা ধারণ করবে। কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তরে চাপ এত বেশি যে গলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গলিত বস্তুর স্বাভাবিক আয়তন বৃদ্ধি হতে পারে না।

এই কারণেই এত বেশি তাপ হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীতে খনিজ দ্রব্যগুলি কঠিন অবস্থাতেই পাওয়া যায়।

কেবলমাত্র যে সকল স্থানে পৃথিবীর ত্বক ফেটে গভীর ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে, সে সকল স্থানের অভ্যন্তরে চাপ খুবই কম এবং সেখানে অবস্থিত ধাতব বা অন্যান্য পদার্থ গলিত অবস্থাতেই থাকবে। এই সব গলিত পদার্থ লাভার রূপ ধারণ করে ফাটল বেয়ে ভূপৃষ্ঠে বার হয়ে আসবে।

মাটির গভীর তলদেশে যে ধাতব পদার্থ আছে তা কেবলমাত্র গর্ত খুঁড়লেই যে আমরা বুঝতে পারি তাই নয়। এই ভাবে ভূত্বকের উপরের অংশই পরীক্ষা করা চলতে পারে। পৃথিবীবক্ষে সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্রের কম্পন দেখেই কেবলমাত্র আমরা বলতে পারি যে অভ্যন্তরে কি আছে।

ভূত্বক সকল সময়ই চঞ্চল, যদিও এই অস্থিরতা অত্যন্ত নিখুঁত যন্ত্রের সাহায্যেই উপলব্ধি করা যেতে পারে। যখন, ভূত্বকের কম্পন সময় সময় বেশি এমনকি ধ্বংসাত্মক হয়ে পড়ে, তখন আমরা বলি ভূমিকম্প হচ্ছে।

পৃথিবী পৃষ্ঠে কম্পনসৃষ্টিকারী ধাক্কাগুলো ঘটে ভূত্বকের স্থানে স্থানে স্খলনের জন্য। এই ঘটনা সাধারণত দেখা যায় পার্বত্য অঞ্চলে, বিশেষত প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে এবং আতলান্তিক মহাসাগরের মধ্যস্থলে উত্তর থেকে দক্ষিণ ব্যাপী অঞ্চলে। ভূমিকম্পের বিস্তীর্ণ এলাকা ওখত্‌স্‌ সাগরের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ সীমা ধরে চলে গেছে পশ্চিম সীমা পর্যন্ত।

বড় বড় ভূমিকম্পের পর ফাটল সংলগ্ন অঞ্চলে ভূত্বকের নাড়াচাড়া দেখা যায়। ফাটলের একধারে ভূত্বকের বেশ কিছুটা

অংশ নেমে যায় যাকে বলা হয় ধ্বস। কিন্তু ভূত্বকের এই স্খলন অনেক সময় অনুভূমিকও হতে পারে।

এইরূপ ঘটেছিল ১৯০৬ সালে উত্তর আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার ভূমিকম্পে। ক্যালিফোর্নিয়া প্রায় ৭৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ এক ফাটলের দ্বারা দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ভূমিকম্পের সময় এই ফাটলের পাশে অনুভূমিক ভাবে প্রায় ৬ মিটার পর্যন্ত পৃথিবীর অংশ সরে যায়। পরস্পর ছেদকারী ফাটলের মাধ্যমে রাস্তায় কিম্বা ঝোপের ধারে এই ব্যাপার দেখা গিয়াছিল।

অবশ্য ভূত্বকের এত বেশি ওলটপালট যখন হয় তখন কম্পনের পরিমাণও খুবই বেশি হয়।

মাটির নীচে ভূমিকম্পের কেন্দ্রের ঠিক উপরে একটা ধাক্কা অনুভব করা যায়। কিন্তু ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল থেকে দূরে ভূপৃষ্ঠে কম্পনটা কমে যায়। প্রথম অবস্থায় ধাক্কার ফলে সব কিছু উঁচু দিকে উঠে পড়তে চায়, দ্বিতীয় অবস্থায় উল্টে পড়ে।

এই কম্পনের কোণ জানা থাকলে এবং কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠে এর বিস্তৃতি মাপা গেলে সহজেই কোন গভীরতা থেকে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়েছে তা বোঝা যাবে।

ভূমিকম্প সাধারণত ১০ কিলোমিটার পরিমাণ গভীরতা থেকে উৎপন্ন হয়। জোরালো কম্পন আরও গভীরত্বে সৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু ৮০০-৯০০ কিলোমিটারের থেকে বেশি দূরে হয় না। ধাক্কার ফলে ঢেউ এর মতো পৃথিবীর চতুর্দিকে কম্পনের সৃষ্টি হয়।

এই তরঙ্গের সাহায্যে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ বস্তুগুলির অবস্থা

নিরূপণ করা যায়। তরঙ্গের এই গতি নির্ভর করে কোনো বস্তুর ঘনত্ব, তার প্রতি কণার গতিবিরোধী শক্তি এবং স্ফীতিবিরোধী শক্তির উপর। সেই কারণে তরঙ্গের গতি থেকে নির্ণয় করা যায় কেমন করে বস্তুর মধ্যে দিয়ে কেন্দ্র পর্যন্ত তরঙ্গগুলো চলে যাচ্ছে।

কম্পনগুলি দু জাতের। যদি একটা টানকরা সুতোর উপর আঙুলের আঘাত করা যায় তবে তার প্রতি কণা গতিশীল হবে এবং এই গতি সূতোর মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হয়ে প্রত্যেক কণাটিকে সচল করে তুলবে।

এই তির্যক কম্পন কেবলমাত্র কঠিন কেন্দ্র হলেই সম্ভব— যেমন ধাতব পদার্থ, পাথর এবং অনুরূপ বস্তুতে যেখানে কণাগুলি গতিবিরোধী। জল, তেল কি অন্য তরল পদার্থে তির্যক কম্পন সম্ভব নয়; কারণ পদার্থটির সেই অংশ গতিরোধ করতে পারে না বলে পূর্বস্থানে আর ফিরে আসতে পারে না।

কিন্তু লম্বালম্বিভাবেও কম্পন হয়। এগুলো শব্দজনিত বাতাসের কম্পনের মতো। এক্ষেত্রে কণাগুলির কম্পন হয় বিস্তারের দিক দিয়ে। তরল পদার্থে লম্বালম্বি ভাবে কম্পন হয়।

এই শতাব্দীর প্রথমে রুশীয় বিজ্ঞানী গলিতসিন পৃথিবীর মাধ্যমে বহু দূরের ভূমিকম্পের কম্পনের বিস্তার সম্বন্ধে গবেষণা করেন।

বহুদূরে উৎপন্ন ভূমিকম্পের কম্পন পরিমাপ সহজ নয়— যেমন কামস্কাটাকায় উৎপন্ন ভূমিকম্প মস্কোয় আসতে প্রায় ২০০০ কিলোমিটার গভীরতা ভেদ করে।

কামস্কাটকায় যেখানে কম্পনের উদ্ভব হয়েছে সেখানে পৃথিবীপৃষ্ঠ খুবই আন্দোলিত হবে। কিন্তু মস্কোয় কম্পনের বেগ এতই কম হবে যে মাটির কম্পন বোধহয় এক মিলিমিটারের এক দশমাংশ কি এক শতাংশ বা এক সহস্রাংশেরও কম হবে।

গলিতসিনের সিসমোগ্রাফ একটি অতি সহজ সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধরা যাক একটি সুরক্ষিত ঘরে যেখানে যানবাহন, ট্রেন কি যন্ত্রপাতির শব্দ যায় না সেখানে স্থিরভাবে রয়েছে একটি দোলক।

যখন দূরের কোনো ভূকম্পন থেকে তরঙ্গ এসে পৃথিবীকে সরিয়ে দেয় ডানদিকে তখন দোলকটি জড়তার ফলে স্থির থাকে, কিন্তু কোনো পর্যবেক্ষকের চোখে মনে হবে দোলকটি বাঁ দিকে সরে যাচ্ছে। আবার যখন পৃথিবী সরে যাবে বাঁ দিকে তখন দোলকটি মনে হবে যেন সরে যাচ্ছে ডান দিকে।

দোলকের প্রান্তে সংলগ্ন আছে একটা কলম যা কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে চলন্ত ফিতায় দাগ কেটে যাবে—সিসমোগ্রাফ বলা হয় যাকে। এরই পাশে হিসাব পাওয়া যাবে, এক সেকেণ্ডে কত বার কেমনভাবে দোলকটি দুলেছে।

যন্ত্রগুলি সঠিকভাবে কাজ করতে পারে কতগুলো সর্তে। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হচ্ছে এই যে দোলকটি নিজে থেকে যেন না নড়ে, তাহলে মাটির কম্পন লিপিবদ্ধ না হয়ে দোলকের দোলনই রেখাবদ্ধ হবে।

সিস্‌মোগ্রাফ—সাধারণত এটি একটি অনুভূমিক দণ্ড যার এক প্রান্তে একটি ওজন আছে। মাঝে একটি সূতোর দ্বারা দণ্ডটি

অপর একটি খাড়া দণ্ডের উপর প্রান্ত হতে ঝুলছে। অপর প্রান্তটি সূতার দ্বারা ভুমির সহিত যুক্ত। কাজেই দণ্ডটি শূন্যে অনুভূমিকভাবে দুটি সূতার সাহায্যে ঝুলছে। (৫নং ছবি)
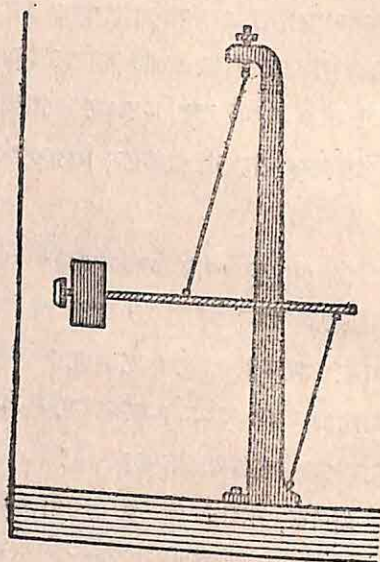
৫নং ছবি

দণ্ডটি অনুভূমিক তলে নড়ে। দণ্ডের উপরের সূতা এবং খাড়া দণ্ডের দ্বারা সৃষ্ট কোণের পরিমাণ কম করলেই দোলকের প্রকৃত পর্যায়কাল দীর্ঘতর করা যাবে।

এইরূপ দোলক নিজে নিজে অচল অবস্থা থেকে সচল হতে পারে না, কেবল পৃথিবীর কম্পনই একে সচল করতে পারে। গলিতসিন তাঁর সিস্‌মোগ্রাফের জন্য এমন দোলক ব্যবহার করেছিলেন।

এই যন্ত্রের কম্পনের পরিমাণ এক মিলিমিটারের এক দশমাংশ কি এক শতাংশ মাত্র। কিন্তু পরীক্ষা করতে হলে এগুলোকে কয়েক শত গুণ বা কয়েক হাজার গুণ বাড়াতে হবে।

বাড়ানোর সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে দোলকে একটা ছোট্ট আয়না আটকে দেওয়া যা থেকে অনেকদূরে একটা পর্দায় আলো প্রতিফলিত হবে। আয়নার সামান্য দোলা পর্দায় অনেক বেশি বলে মনে হবে।

দোলকটি স্থির থাকে, কিন্তু ভূমিটি আলো এবং পর্দার সঙ্গে দুলতে থাকে, কাজেই আলোর প্রতিফলনও পর্দার উপর নড়তে থাকে।

প্রতিফলিত আলো আবার গিয়ে পড়ে ফটোগ্রাফের ফিল্মের উপর এবং তার ছবি উঠে যায়। আলোর প্রতি স্নবেদী ফিতাটি ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরতে থাকে, আর আলোর আঁকা বাঁকা গতিরেখা সিস্‌মোগ্রাফ নির্দেশ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে।

খাড়াখাড়ি কম্পন লক্ষ্য করবার জন্য একটি যন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। এক প্রান্ত খাড়া একটি দণ্ডের উপর কব্‌জার সাহায্যে ঘোরে এমন একটি দণ্ড ঝোলানো হয়েছে, মধ্যে একটা গোটানো স্প্রিং-এর সাহায্যে। দণ্ডটির অপর প্রান্তে আছে ওজন সমেত একটি কাঁটা যা ঘুরন্ত একটি ড্রামের গায়ে আঁটা ফিতা স্পর্শ করে আছে। (৬নং ছবি)

পৃথিবীর লম্বালম্বি কম্পনের সময় ওজনটি স্থির থাকে, দণ্ড এবং ড্রামটি উপর নীচে নড়ে। মনে হয় যেন কাঁটাটি নড়েচড়ে চলন্ত ফিতার উপর আঁচড় কাটছে।

আজকাল বৈজ্ঞানিকরা গলিতসিনের যন্ত্রের থেকে উন্নততর যন্ত্র তৈরি করেছেন। কিন্তু আসলে সেগুলো গলিতসিনের সিস্‌মোগ্রাফের মতই, কেবল আরও সঠিক এবং সহজভাবে তারা কাজ করে।
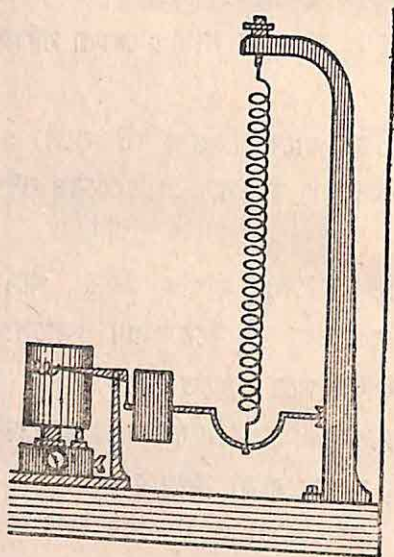
৬নং ছবি

আমাদের দেশ এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ভূকম্পন-পরিমাপ কেন্দ্রগুলিতে সিস্‌মোগ্রাফের সাহায্যে কম্পন লক্ষ্য করা হয় এবং কম্পনগুলির কোণ কি তাও হিসাব করা হয়।

সিস্‌মোগ্রাফ থেকে ঐ স্থানে কিভাবে কম্পন এসে পৌঁচেছে এবং তার গতিই বা কি এই সব তথ্যও জানা যায়।

কিন্তু বিভিন্ন গভীরতায় কম্পনগুলি কি গতিতে যাচ্ছে তা বোঝবার উপায় কি ?

এটি একটি জটিল সমস্যা। উৎপত্তিকেন্দ্র থেকে বিভিন্ন স্থানে কম্পন অনুভূত হবার সময়ের পার্থক্য দেখে এই সমস্যার সমাধান করা যায়।

ঐ সব তথ্য সংগ্রহ করে জটিল গণনার পর বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করেছেন যতই পৃথিবীর অভ্যন্তরে যাওয়া যাবে ততই কম্পনের গতি বেশি হবে। এর অর্থ এই যে পৃথিবীর অভ্যন্তরে কঠিনতা এবং স্থিতিস্থাপকতা ক্রমশই বৃদ্ধি পায়।

এ ছাড়াও দেখা গেছে যে তির্যক কম্পন যা কেবল কঠিন বস্তুর মধ্য দিয়েই বিস্তার লাভ করে তা ২৯০০ কিলোমিটারের নীচে আর সঞ্চারিত হয় না।

সুতরাং ২৯০০ কিলোমিটার গভীরতায় হঠাৎ পৃথিবীর গঠন-বস্তু পরিবর্তিত হয়েছে—তরল পদার্থের জন্মই পৃথিবীর কেন্দ্রে তির্যক কম্পন বিস্তারিত হয় না।

কিন্তু পৃথিবীর কেন্দ্রস্থ এই উপাদানকে সাধারণ তরল পদার্থের মতো মনে করলে চলবে না। এখানে প্রায় প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ২০ লক্ষ কিলোগ্রাম পরিমাণ চাপ বর্তমান।

ঐ ভীষণ চাপে তরল পদার্থের এমন নতুন নতুন ধর্ম হতে পারে যা আমাদের অজ্ঞাত।

এমনকি গবেষণাগারের পরীক্ষাতেও তাই দেখা যায়। যেমন বায়ুমণ্ডলের চাপ যদি দশ হাজার গুণ হয় তাহলে এক

তাল ভিজে কাদাও ইস্পাতের ফলকের মধ্যে ঢুকে যাবে, মোমও ইস্পাতের মধ্যে ঢুকে যাবে।

এই কারণেই এখনও পর্যন্ত এর চেয়েও শতগুণ বেশি চাপের মধ্যে অবস্থিত পৃথিবীর কেন্দ্রের উপাদানগুলোর সাধারণ ধর্ম বোঝা যায় নি। কিন্তু তির্যক কম্পনের সম্পর্কে কেন্দ্রস্থ উপাদান তরল পদার্থের রীতি অনুযায়ীই কাজ করে।

রুশীয় ভূপদার্থবিদ্‌দের সাম্প্রতিক পরীক্ষাতে জানা গেছে যে ৭০০০ কিলোমিটার ব্যাসযুক্ত এই কেন্দ্রের মধ্যে ছোট আরও একটি প্রায় ২৮০০ কিলোমিটার ব্যাপী স্থান আছে। এই ছোট বৃত্তটিতে কঠিন পদার্থের ধর্মই কাজ করে, কারণ তির্যক কম্পনগুলি এখানে বিস্তারলাভ করতে পারে।

আমাদের পৃথিবী কি দিয়ে তৈরি ?

আমরা পৃথিবীর কয়েকটি বিশেষত্ব জানলাম, কিন্তু এখনও আর একটি প্রশ্ন রয়েছে—আমাদের এই গ্রহ কি দিয়ে তৈরি ?

এ সম্বন্ধে কেবলমাত্র ভূত্বকের শিলার প্রকার এবং সমস্ত পৃথিবীর গড় ঘনাঙ্ক বা আপেক্ষিক গুরুত্ব বা অপর কতকগুলো পরোক্ষ বিষয়ের সাহায্য নিতে হয়।

ভূত্বকের শিলা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকরা অনেক দিন থেকেই গবেষণা করেছেন। তাতে দেখা গেছে প্রধানত কতকগুলি ধাতু, যেমন অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও লোহা অম্লজানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই শিলা গঠন করেছে।

বৈজ্ঞানিকদের গণনা অনুযায়ী ভূত্বকের আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় ২·৭৫ অর্থাৎ এক ঘন মিটার পরিমিত শিলার ওজন গড়ে ২·৭৫ টন।

যদি পৃথিবীর সবটাই ঐ রকম শিলার দ্বারা গঠিত হত তবে পৃথিবীর ভর নির্ণয় করা সহজ হত। ২·৭৫ টনকে পৃথিবীর আয়তন যত ঘন মিটার তত দিয়ে গুণ করলেই এই হিসাবটি পাওয়া যেত। কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তরে কি আছে তা তো আমরা জানি না।

তাহলে কি ভাবে পৃথিবীর ভর নির্ণয় করা যাবে ? পৃথিবীর ভর নির্ণয় করতে হলে প্রয়োজন অন্য বস্তুকে পৃথিবী কি শক্তিতে

আকর্ষণ করে তা জানা। কারণ ভরের উপরই পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি নির্ভর করে।

শুধু পৃথিবী নয়, সকল বস্তুই পরস্পরকে আকর্ষণ করে। কিন্তু তাদের আকর্ষণ খুব কম হওয়ায় আমরা বুঝতে পারি না।

কিন্তু একটা বিরাট বস্তু (যেমন একটা পাহাড়) লম্বসূত্রকে কিছুটা নিজের দিকে টেনে নেবে। এর সাহায্যে পৃথিবী এবং পাহাড়ের ভরের তুলনা করা যেতে পারে। লম্বসূত্রের সীসক পিণ্ডের উপর পাহাড়ের আকর্ষণ পরিমাপ করে পৃথিবীর আকর্ষণের তুলনা করতে হবে, অবশ্য তার আগে দেখতে হবে যে সীসক পিণ্ডটি ভূকেন্দ্রের চেয়ে পাহাড়ের ভরকেন্দ্রের কাছে আছে।

পাহাড়ের কাছে পরীক্ষা চালিয়ে বৈজ্ঞানিকরা দেখেছেন সত্যসত্যই সীসক পিণ্ডটি পাহাড়ের দিকে আকৃষ্ট হয়। এই নতি-কোণ যদিও খুব সামান্য, তবু তা পরিমাপ করা যায় এবং এই কোণের পরিমাপ অনুযায়ী পাহাড়ের আকর্ষণী শক্তিও বোঝা যায়।

দেখা গেছে যদি পৃথিবীর গঠন সর্বত্রই ঐ রকম পাহাড়ের মতো হত তবে তার আকর্ষণী শক্তি অর্ধেক হত প্রকৃত আকর্ষণী শক্তির চেয়ে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেও কয়েকজন বৈজ্ঞানিক এই পরীক্ষা করেছেন। তাঁরা পাহাড়টা খুব ভালভাবে জরিপ করেছেন সঠিকভাবে তার ঘন এবং ভর নির্ণয়ের জন্য।

কিন্তু এ সমস্যা সাধারণ সমস্যা নয়। অনেক ভুল হবার

সম্ভাবনাই রয়েছে এতে। পাহাড়ের ভরকেন্দ্র নির্ণয় করে তার থেকে সীসকপিণ্ডের সঠিক দূরত্ব নিরূপণ করা সহজ নয়।

এই কারণে বৈজ্ঞানিকরা পৃথিবীর ভর নির্ণয়ের অন্য পন্থা অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

যদি আমরা একটি ছোট গোলকের উপর পৃথিবী এবং অপর একটি সীসকপিণ্ডের আকর্ষণী শক্তির তুলনা করতে পারি তবে সঠিকভাবেই আমরা ভর নির্ণয় করতে পারব—সমস্ত সীসকপিণ্ডটিই দেখা যায়, তার ব্যাস, ভার ঠিকভাবে জানা যায় এবং ছোট্ট গোলকটি থেকে তার দূরত্বও পরিমাপ করা যায়।

কিন্তু ছোট্ট একটি গোলকের উপর সীসকপিণ্ডের আকর্ষণ পরিমাপ করার কল্পনা অনেকদিন সফল হল না; কারণ এজন্য প্রয়োজন অত্যন্ত নিখুঁত যন্ত্রের।

ব্যাবর্তন তুলাদণ্ডের দ্বারাই কেবলমাত্র এমন গণনা করা যেতে পারে।

ব্যাবর্তন তুলাদণ্ডের প্রস্তুত প্রণালী সরল—একটি হাল্কা কাঠের ঝুলন্ত দণ্ডের দুই প্রান্তে দুটি সীসার পিণ্ড, দণ্ডটির মাঝে এমন একটি ধাতব তার বাঁধা যা বাঁকাতে কষ্ট হয় না। দণ্ডটিকে অনুভূমিক করে ঘুরিয়ে ছেড়ে দিলে ওটা স্থির না থেকে অনুভূমিক তলে দোলকের মতো দুলবে। দণ্ডের দোলনকাল হিসাব করে তারটির বাঁধার পরিমাণ নির্ণয় করা যাবে।

ব্যাবর্তন তুলাদণ্ডের সাহায্যেই সর্বপ্রথম বড় একটি গোলকের ছোট গোলককে আকর্ষণের শক্তি পরিমাপ করা হয়েছিল।

ছোট দুটি সীসকপিণ্ডের সমান দূরে বিপরীত দিকে দুটি

বড় পিণ্ড রাখা হয়। প্রত্যেক পিণ্ডের মধ্যবিন্দু একই অনু-ভূমিক তলে অবস্থিত। ছোট পিণ্ড দুটি বড় পিণ্ড দুটির দিকে আকৃষ্ট হয়, যেমন লোহা আকৃষ্ট হয় চুম্বকের দিকে, ফলে ধাতব তারটি পাক খেয়ে যায়।

তারটির পাকানোর পরিমাপ করে বৈজ্ঞানিকরা বড় পিণ্ড দুটির ছোট পিণ্ড দুটিকে আকর্ষণের শক্তি নির্ণয় করেছেন। ছোট পিণ্ডটির ভার হচ্ছে পৃথিবীর অভিকর্ষ যা ওর উপর কাজ করছে।

তুলনা করতে গেলে অবশ্য মনে রাখতে হবে যে পৃথিবী এবং বড় সীসকপিণ্ডটি ছোট পিণ্ডকে এমনভাবে আকর্ষণ করছে যেন প্রত্যেক বস্তুর ভরই রয়েছে তাদের কেন্দ্রে।

ব্যাবর্তন দোলকের সাহায্যে অত্যন্ত সঠিকভাবেই বৈজ্ঞানিকরা পৃথিবীর ভর নির্ণয় করেছেন। এই ভর হচ্ছে সমপরিমাপের জলের একটি গোলকের ভরের ৫·৫২ গুণ বেশি।

কিন্তু ভূত্বকের শিলার গড় আপেক্ষিক গুরুত্ব পুরো পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্বের প্রায় অর্ধেক। এর থেকে বোঝা যায় পৃথিবীর অভ্যন্তরে আরও ভারী কোনো শিলা আছে।

ভূত্বকের সাধারণ শিলা গ্র্যানাইট, বেসল্ট ও অন্যান্য সব পদার্থের চেয়েও অনেক ভারী শিলা দেখা যায়—যেমন লোহা। যদি পৃথিবীর অভ্যন্তরে লোহা থাকে তবেই এই ভীষণ ভারের কারণ ব্যাখ্যা করা যায়। সত্যিই ভূত্বকের শিলা পরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিকরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে যতই

গভীরে যাওয়া যাবে ততই শিলার মধ্যে লোহার পরিমাণ বেশি হবে।

ভূত্বকের উপরাংশে রয়েছে স্তরীভূত শিলা। তার তলায় গ্রানাইট—যা সমস্ত মাটির ভিত্তি।

গ্র্যানাইটের এই স্তরের গভীরত্ব প্রায় ১০—১৫ কিলোমিটার। এর নীচে আছে কালো শিলার বেসল্ট স্তর যার মধ্যে লোহার অংশ গ্রানাইট কি স্তরীভূত শিলার চেয়ে বেশি।

পৃথিবীপৃষ্ঠের কোন কোন স্থানে আরও নীচে থেকে বার হয়ে আসে একরকম শিলা; আরও বেশি লোহা আছে যাতে—তার নাম অতি-কঠিন শিলা।

এই কারণেই বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন ভূত্বকের উপরের অংশের পর প্রায় ১২০০ কিলোমিটার পর্যন্ত এই অতি-কঠিন কালচে সবুজ শিলাই রয়েছে, যার মধ্যে লোহা আর ম্যাঙ্গানিজ আছে বেশি পরিমাণে।

১২০০ কিলোমিটারের নীচে নিশ্চয়ই আরও ভারী শিলা আছে—তবেই পৃথিবীর গড় আপেক্ষিক গুরুত্ব ৫˙৫২ হওয়া সম্ভব। যদিও পার্থিব শিলার মধ্যে অতি কঠিন কালচে সবুজ রঙের শিলার চেয়ে ভারী শিলা বড় একটা পাওয়া যায় না, তাহলেও এরূপ শিলা যে একেবারে নেই সেকথা বলা যায় না।

এগুলো হচ্ছে লোহা-পাথর কিম্বা লোহার উল্কাপিণ্ড যা শূন্য থেকে পৃথিবীতে এসে পড়ে।

লোহা-পাথরের উল্কাপিণ্ড হচ্ছে অতি-কঠিন কালচে সবুজ শিলা এবং বিভিন্ন অনুপাতে লোহার মিশ্রণে তৈরী। পৃথিবীর

অন্যান্য শিলার চেয়ে এ শিলাপিণ্ড বেশি ভারী এবং এতে লোহার পরিমাণও অনেক বেশি।

আকাদমি সদস্য আ. এ. কের্সমান মনে করেন লোহা-পাথরের উল্কাপিণ্ডের মতো পদার্থ দিয়েই অতি কঠিন শিলা এবং ভূকেন্দ্রের অন্তর্বর্তী অংশটি গঠিত।

এক্ষেত্রে অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকদের মতোই মনে করা স্বাভাবিক যে পৃথিবীর কেন্দ্রও অন্যান্য লোহা-পাথরের উল্কাপিণ্ডের মতোই সম্পূর্ণ লোহা দিয়েই তৈরি।

পৃথিবীর উৎপত্তি

কি ভাবে আমাদের পৃথিবীর উৎপত্তি হল এই প্রশ্ন খুবই জটিল। এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞান এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর দিতে পারে নি।

রুশ বিজ্ঞানী ও. উ. শ্মিড্‌ট্‌ এবং ভে. জে. ফেসনকফ যে আলোচনা করে গিয়েছেন তা হচ্ছে সৌরজগতের গ্রহগুলির উৎপত্তির বিষয়টি সম্বন্ধেই।

ও. উ. শ্মিড্‌ট্‌ মনে করেন যে বহুপূর্বে সূর্যের চারিদিকে ছিল চ্যাপ্টা "মেঘের" আকারের একটি গোলাকার পদার্থ— জাগতিক ধূলিকণা, গ্যাস এবং অন্যান্য অমসৃণ কণিকা দিয়ে যা তৈরি।

এই "মেঘের" বিভিন্ন কণাগুলি সূর্যের চারদিকে বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরত। পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে লেগে কতকগুলি কণা একসঙ্গে মিশে গিয়ে এখনকার গ্রহগুলির কক্ষপথে ঘুরতে আরম্ভ করে দেয়। এগুলিই হচ্ছে এখনকার গ্রহগুলির মূল পদার্থ।

জাগতিক কণিকার মধ্য দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এগুলো ক্রমশই বড় হতে থাকে, যেমন বরফের মধ্য দিয়ে গড়াতে গড়াতে বরফের বলগুলো বেড়ে যায়।

এমনিভাবেই পৃথিবীরও সৃষ্টি হয়েছে ও. উ. শ্মিড্‌টের মতে।

প্রথমে জাগতিক কণিকার পরিমাণও বেশি ছিল। কিন্তু গ্রহ তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই "মেঘের" পরিমাণও কমে এল।

প্রথমে যখন এমনি কণার সমষ্টিতে গ্রহ তৈরি হল তখন তার সকল অংশই ছিল এক রকম। কিন্তু ক্রমে কণাগুলো জায়গায় জায়গায় চাপ পেয়ে সুসংবদ্ধ হয়ে উঠ্‌ল। পৃথিবী হয়ে উঠ্‌ল এমনি একটি সুসংবদ্ধ সমষ্টি, যার মধ্যে হাল্কা এবং ভারী কণা-গুলোর অবস্থানের পরিবর্তন হতে শুরু করল।

কঠিন পৃথিবীর অতিরিক্ত সান্দ্রতা (viscousness) কঠিন মোমের সান্দ্রতার ১০ কোটি গুণেরও বেশি। ফলে এই স্থান পরিবর্তনের গতি খুবই কম, যদিও আজও তা চলছে।

ভারী লোহার কণিকাগুলো ক্রমশঃ নীচে নেমে যাচ্ছে। পাথরের কণাগুলো উঠে আসছে উপর দিকে, ভূত্বক তৈরি হচ্ছে।

পৃথিবী-সৃষ্টিকারী কণাগুলো ছিল ঠাণ্ডা। যদিও ধাক্কাধাক্কির সময় ওগুলো গরম হয়ে উঠত, তবুও এই তাপ শীঘ্রই মহাশূন্যে মিলিয়ে যেত।

কিন্তু এই সব প্রস্তর-কণিকা যা পৃথিবীপৃষ্ঠে উঠে আসত, তাদের মধ্যে তেজষ্ক্রিয় পদার্থও ছিল। এই তেজষ্ক্রিয় পদার্থগুলো ভাঙবার সময় উত্তাপের সৃষ্টি হয়।

ভূত্বকের তাপ-পরিবাহী শক্তি ভাল না হওয়ায় এই তাপ পৃথিবীর ত্বকেই আবদ্ধ থাকে। এই কারণেই খনি কিম্বা গহ্বরের মধ্যে উত্তাপ বৃদ্ধি পায়।

আকাদমি সদস্য স্মিড্‌টের মতে পৃথিবীর একেবারে অন্তঃস্থলে তাপ এখনও বেড়ে চলেছে। কিন্তু তাঁর মতে ভূত্বকে

"উত্তাপ সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করে আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। ভূত্বকের স্থানে স্থানে যেখানেই তেজষ্ক্রিয় পদার্থের পরিমাণ বেশি সেখানেই উত্তাপ শিলার গলনাঙ্কের সমান হয় (১০০০°—১৩০০°)। এই গলিত শিলা পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে মাঝে মাঝে অগ্ন্যুৎ-পাতের আকারে বার হয়ে আসে। কিন্তু এই রহস্য স্থানীয় একটি ঘটনা মাত্র।"

স্মিড্ট্ আরও বলেছেন, "এই প্রশ্ন সম্বন্ধে এই নতুন মতবাদ অধুনা প্রচলিত ভূতত্ত্বের এই ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী যে পৃথিবী প্রথমে ছিল উত্তপ্ত গলিত পদার্থ এবং ধীরে ধীরে ভূত্বক শীতল হয়ে এসেছে।

আকাদমি সদস্য ফেসনকফ প্রমাণ করেছেন বিবর্তনের দিক থেকে সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। এ কারণেই সূর্য এবং সৌরজগৎ গঠিত হয়েছে গ্যাস এবং ধূলিময় মেঘ ঘনীভূত হয়ে, এরই সর্বাপেক্ষা সুসংবদ্ধ মধ্যভাগ হচ্ছে আদি সূর্য।

যেহেতু সূর্য বিরাট এবং অত্যন্ত দ্রুত আবর্তনশীল, সেইজন্য যে গ্যাস ও ধূলিময় মেঘ থেকে তার উৎপত্তি সেই মেঘও তার চারদিকেই থেকে গেল।

সূর্যের চতুর্দিকে ভ্রাম্যমাণ এই মেঘ অত্যন্ত দ্রুত ঘোরার জন্য একটি জমাট বস্তুতে পরিণত হতে পারল না। গ্রহগুলো সৃষ্ট হল তা থেকেই।

ফেসনকফের মতে গ্রহগুলির উৎপত্তি হয়েছে সূর্য থেকে কিছুটা মেঘের বিচ্যুতির ফলে। পরবর্তী গ্রহের উৎপত্তি হল প্রথম গ্রহের এত দূরে যে এর আকৃতি-গঠনের দিক দিয়ে প্রথম গ্রহটির

অথবা সূর্যের কোনো প্রভাব নেই। এই মতের সাহায্যে সূর্যের চতুর্দিকে গ্রহগুলির সংস্থানের কারণও বোঝা যায়।

প্রথমে প্রত্যেক গ্রহই ছিল গ্যাসীয় পদার্থের গোলক, যার মাঝখানটা ছিল অপেক্ষাকৃত কঠিন এবং ছোট। বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন প্রভৃতি বড় গ্রহগুলির আয়তন বড় হওয়ায় তাদের গ্যাসীয় মেঘমণ্ডল বজায় রইল। অন্য ছোট গ্রহগুলি সূর্যের কাছাকাছি থাকায় আদিতে তাদের যে গ্যাসীয় মণ্ডল ছিল তা রক্ষা করতে পারল না। রয়ে গেল কেবল তাদের কঠিন কেন্দ্রটুকু; পরে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন গ্যাসের সাহায্যে সেই কেন্দ্র আবৃত হল বায়ুর দ্বারা।

উপসংহার

পৃথিবীর উপাদান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে গিয়ে আমরা দেখছি যে অন্যান্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথিবীর কথা ভাবা যায় না। মহাশূন্যে অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রের সঙ্গে পৃথিবীর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ।

পৃথিবীরও পরিবর্তন চলছে—পাহাড় উঠ্‌ছে আবার নেমে যাচ্ছে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিভিন্ন পদার্থের স্থান পরিবর্তন চলছে। জলরাশির ঘর্ষণের ফলে পৃথিবীর গতি ক্রমেই কমে আসছে এবং তার ফলে পৃথিবীর আকারের পরিবর্তন ঘটছে।

বাতাস, জল ও তাপের তারতম্য প্রভৃতির ফলে পৃথিবীর উচুনিচু ঘুচে গিয়ে পৃথিবী সমতল হয়ে উঠছে।

এমনিভাবে পৃথিবী ক্রমশই পরিবর্তিত হচ্ছে। ভূতত্ত্ববিদ, ভূপরিমিতিবিদ্, ভূপদার্থবিদ, ভূরসায়নবিদ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকরা সকলেই পৃথিবী-বিজ্ঞানের সাহায্যে সমস্ত গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটিত করছেন। এর ফলে মানুষ লাভ করছে প্রকৃতির উপর আরও প্রভাব, লাভ করছে তার বিশাল, অফুরন্ত শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা।